নির্বাচিত

দারসে কুরআন

প্রথম খণ্ড

জুনাব আলী ভূঁইয়া

নির্বাচিত

দারসে কুরআন

প্রথম খণ্ড

নির্বাচিত
দারসে কুরআন
[প্রথম খণ্ড]

জুনাব আলী ভূঁইয়া

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার ❖ কাঁটাবন ❖ বাংলাবাজার

নির্বাচিত দারসে কুরআন-১

জুনাব আলী ভূঁইয়া

প্রকাশনায়

আহ্সান পাবলিকেশন

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০
মোবাইল : ০১৭২৮১১২২০০

ISBN 984-32-1681-5

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৪

পঞ্চম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১৪

প্রচ্ছদ

মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পোজ
মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহ্সান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
নীলক্ষেত, ঢাকা

বিনিময় : একশত দশ টাকা মাত্র

Nirbachito Dars-e-Quran 1st Part by Junab ALi Bhuiyan and Published by **Ahsan Publication** 38/3 Banglabazar, Dhaka, First Edition October 2004 5th Print February 2014. Price Tk. 110.00 only.

AP- 27

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

"দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত লেখাপড়ার সময়"

সার্টিফিকেট পাওয়ার উদ্দেশ্যেই লেখাপড়া নয়। সার্টিফিকেট পাওয়ার পর প্রকৃত লেখাপড়া। আমি পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক ছিলাম। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিভিন্ন প্রকার ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে আসছি। তবে আল-কুরআন অধ্যয়নের মজাই আলাদা। দুনিয়ার অন্যসব কিছুতে ভেজাল থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কালামে কোন ভেজাল নেই। তাই আল-কুরআনের বিশুদ্ধ চর্চাই আল্লাহর রেজামন্দি লাভের সহজ সরল পথ বলে আমি মনে করি। তাই আল্লাহকে সহজে সন্তুষ্ট করার এ পথে একা অগ্রসর না হয়ে আরও কিছু ভাইকে এ পথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা দানের উদ্দেশ্যেই এ দারস গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করা হলো। আমার বইখানা যদি পাঠকদের কিছুটা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। "কুরআন বুঝা সহজ" বইখানার বাস্তব প্রমাণ আমি পেয়েছি। আসলে অধ্যাপনা, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় মানুষকে সাফল্যের পথে নিয়ে যায়। এই গ্রন্থের পর আরও দুই-একখানা গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা পোষণ করি। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যেন তাওফীক দান করেন।

আমার বড় ছেলে মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া প্রকাশনার সাথে জড়িত। তার নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ পাওয়াতে আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি তার সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

পরিশেষে মহান প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমাকে এ কাজের তাওফীক দান করেছেন। এ কাজে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দয়াময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ প্রচেষ্টা যেন আল্লাহ তায়ালা আমার এবং আমাকে যারা লেখাপড়া শিখিয়ে লালন-পালন করে মানুষ করেছেন তাঁদের নাজাতের উসীলা করেন, আমীন।

তারিখ : ২৫ মার্চ, ২০০৪

জুনাব আলী ভূঁইয়া
বোয়ালিয়া, বরুড়া, কুমিল্লা।

সূচীপত্র

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন তাঁর কালাম আল-কুরআন মহা বরকতময় কদরের রাতে প্রথম নাযিল করেন। তারপর মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩টি বছর ধরে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবীর নিকট আল্লাহ তা প্রেরণ করেন।

এ কুরআনে মানবজাতির জীবন চালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করা হয়েছে। জীবন সমস্যার এমন কোন দিক নেই যার সমাধান আল্লাহ পেশ করেনি। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ। এরপর আর কোন কিতাব অথবা রাসূল মানবজাতির জন্য প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আর কোন বিধান আমাদের নিকট প্রেরণ করবেন না।

এই কুরআন জানা, কুরআন মানা ও কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন একজন মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। তাই আল-কুরআন অধ্যয়ন, আল-কুরআনের দারস দান, আল-কুরআনের দারস শোনা আমাদের অতীব প্রয়োজন।

আলহামদু লিল্লাহ, মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ এ কাজটি অব্যাহতভাবে করছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিপুল অংশই কুরআন জানে না। মানা ও বাস্তবায়ন তো তাদের দ্বারা সম্ভবই নয়। তাই কুরআনের জ্ঞানচর্চা ও মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া মুমিনদের জন্য সর্বপ্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই তো রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।” (বুখারী, তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন, “যার অন্তরে আল-কুরআনের কোন জ্ঞান নেই তা বিরাণ ঘরতুল্য।” (তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, “যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে।” (আবু দাউদ, মিশকাত)

আল-কুরআনের দারস দান পদ্ধতি

১। যে ব্যক্তি দারস দিবেন তার দারস শোনার জন্য অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, বুঝার ক্ষমতা, সুযোগ, ঈমানী চেতনা, চিন্তাশক্তি, দূরদর্শিতা, ব্যস্ততা, চাহিদা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাসম্ভব জানা থাকতে হবে।

২। আল-কুরআনের কোন সূরার যে অংশটুকু আপনি দারস দিবেন তার মধ্যে সে অংশের শুদ্ধ তিলাওয়াত, বংগানুবাদ, সূরার পরিচিতি, নামকরণ, মূল বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক পটভূমি, ব্যাখ্যা, শিক্ষা ও বাস্তবায়ন এ কয়েকটি দিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৩। উপরোক্ত পয়েন্টগুলো ছাড়াও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তার বাইরেও প্রয়োজনবোধে দারসকে শ্রুতিমধুর করার জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে আরও কিছু পয়েন্ট সংযোজন করা যায়। যেমন দারসের প্রথমে হাম্‌দ ও দরূদ শরীফ, অনুবাদের পর সম্বোধন ও সালাম এবং শেষভাগে ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও তাওফীক কামনা করে সালামের সাথে সমাপ্তি ঘোষণা।

৪। শ্রোতাদের অবস্থা দেখে তাদের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে। শ্রোতাদের যদি ঈমানের দুর্বলতা থেকে যায় তবে আমলের ওয়াজ করলে লাভ হবে না।

৫। দারসের সময়সীমা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সময়ের মধ্যে তিলাওয়াত পাঁচ মিনিট, তরজমা পাঁচ মিনিট, সম্বোধন দুই মিনিট, নামকরণ, সূরা পরিচিতি ও নাযিলের প্রেক্ষাপট সাত মিনিট, ব্যাখ্যা পঁচিশ মিনিট, শিক্ষা ও বাস্তবায়ন দশ মিনিট নির্ধারণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণগান, তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করে দারস শুরু করতে পারেন। যেমন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلاَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দারস : ১

আল্লাহর কাছে মুনাজাত

১. সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭, রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - (٣) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - (٤) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - (٥) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - (٧) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে) (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের রব, (২) যিনি দয়াময় পরম দয়ালু, (৩) বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। (৫) তুমি আমাদেরকে সরল সোজা পথ দেখাও; (৬) তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ; (৭) যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়।

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ - সমস্ত প্রশংসা, رَبٌّ - প্রভু, عٰلَمِيْنَ - বিশ্বজগৎ, মহাবিশ্ব, رَحْمٰن - দয়াময়, رَحِيْم - পরম দয়ালু, يَوْمِ الدِّيْن - বিচারের দিন। اِيَّاكَ - তোমারই নিকট, نَعْبُدُ - আমরা ইবাদত করি, نَسْتَعِيْنُ - আমরা সাহায্য চাই। اِهْدِنَا - তুমি আমাদের দেখাও, صِرَاطٌ - রাস্তা, পথ, مُسْتَقِيْمٌ - সরল, সোজা। اَنْعَمْتَ - তুমি অনুগ্রহ করেছো, غَيْرِ - ব্যতীত। مَغْضُوْب - অভিশপ্ত। ضَآلِّيْنَ - পথভ্রষ্ট।

নামকরণ : সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নামকরণ করা

হয়েছে আল-ফাতিহা। কোন বিষয় আরম্ভ করার পূর্বে ভূমিকা হিসেবে আল-ফাতিহা ব্যবহৃত হয়। আল-কুরআনের সকল সূরার বিশেষ কোন শব্দকে নির্দিষ্ট করে নামকরণ করা হয়েছে। সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস এর ব্যতিক্রম। এর আরও নাম আছে, যেমন– প্রার্থনা, উম্মুল কুরআন, আস-সাবউল মাছানী।

বিষয়বস্তু : সূরাটি হচ্ছে আসলে একটি দোয়া। কুরআনের শুরুতে এ দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য এ মহাগ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মন নিয়ে এর প্রতিটি পাতা পরখ কর। নিখিল বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ্ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস। একথা জানার পর একমাত্র তাঁর কাছেই পথ-নির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে প্রভু! আমাকে সরল পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন– এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ। সূরাটি নামাযের প্রতি রাক্আতে পড়া হয় বলে এটিকে 'আস-সাবউল মাছানীও বলা হয়।

শানে নুযূল : একদিন নবী করীম (সা) নভোমণ্ডলে একজন জ্যোতিষ্মান পুরুষ অবলোকন করলেন। তিনি মহানবী (সা)-কে নাম ধরে ডাকলেন, তিনি "লাব্বায়েক" বলে উত্তর দিলেন। স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট সেই পুরুষ "কলেমা শাহাদাত' পাঠ করে বললেন, "আমাকে ভয় পাবেন না, আমি আপনার বন্ধু জিবরাঈল।" তারপর সেই মহান পুরুষ এই সূরা সম্পূর্ণ পাঠ করলেন এবং মহানবী (সা)-কে তা শিক্ষা দিলেন। (ফাতহুল আজিজ)

ব্যাখ্যা : ১। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামেই।

প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অংগ। আন্তরিকতার সাথে এ কাজ করলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল লাভ করা যায়।

এক. মানুষ অনেক খারাপ কাজ করা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ খারাপ কাজে আল্লাহর নাম নেয়ার কোন অধিকার তার নেই।

দুই. বৈধ, সঠিক ও সৎ কাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নিবে। সে সর্বদা নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে।

তিন. আল্লাহর নামে কাজ শুরু করলে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন থাকবে এবং কাজে বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে। বান্দা যখন আল্লাহর দিকে তাকায় তখন আল্লাহও বান্দার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, এটাই আল্লাহর রীতি। فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।" (বাকারা : ১৫২ আয়াত)

২। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।"

সূরা ফাতিহা আসলে একটি দোয়া। যে সত্তার কাছে আমরা প্রার্থনা করতে চাচ্ছি তাঁর প্রশংসা বাণী দিয়ে দোয়া শুরু করা হচ্ছে। এভাবে যেন দোয়া শুরু করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দোয়া চাইতে হলে ভদ্র ও শালীন পদ্ধতিতে চাইতে হবে। কারো সামনে গিয়ে মুখ খুলেই প্রথমে নিজের প্রয়োজনটা পেশ করে দেয়া সৌজন্য ও সভ্যতার পরিচায়ক নয়। যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে প্রথমে তার গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তার দান ও অনুগ্রহ এবং মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়াই ভদ্রতার রীতি।

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। একথা বলে সৃষ্টির পূজা করার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। দুনিয়ার যেখানে যে বস্তুর মধ্যে যে আকৃতিতেই কোন সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান আছে, আল্লাহর সত্তাই মূলত তার উৎস। কাজেই কোন সৃষ্টিই মানুষের পূজা পেতে পারে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

৩। رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - "যিনি নিখিল বিশ্বজাহানের রব।"

'রব' শব্দটিকে আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এক. মালিক ও প্রভু। দুই. অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। তিন. সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা, পরিচালক ও সংগঠক।

৪। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - "দয়াময় পরম দয়ালু।"

আরবী ভাষায় 'রহমান' একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী এত বেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমাসংখ্যাহীন যে, তা বর্ণনা করার জন্য সবচেয়ে বেশী ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পরও মন ভরে না। তার আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার রাহীম শব্দটিও বলা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে : যেমন– আমরা কোন ব্যক্তির দানশীলতার গুণ বর্ণনা করার জন্য দাতা বলার পরও যখন অতৃপ্তি অনুভব করি তখন এর সাথে দানবীর শব্দটিও লাগিয়ে দেই। রঙের প্রশংসায় 'সাদা' শব্দটি বলার পর আবার ধবধবে সাদা বলে থাকি।

৫। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - "প্রতিদান দিবসের মালিক।"

যেদিন হযরত আদম (আ) থেকে মানবজাতির সমস্ত বংশধরদেরকে একত্র করে তাদের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের হিসাব নেয়া হবে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে, তিনি সেই দিনের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

তিনি শুধু দয়ালু ও করুণাময় নন, একই সংগে তিনি ন্যায়বিচারকও। তিনি হবেন শেষ বিচারে দিনে বিচার ও রায় শুনানীর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। সেদিন তিনি শাস্তি প্রদান করলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না, আর পুরস্কার দিলেও কেউ ঠেকাতে পারবে না। তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন ও করুণা করেন, এজন্য আমরা তাঁকে ভালবাসি আর তিনি ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করেন। তাই আমরা তাঁকে ভয়ও করি এবং এই অনুভূতিও রাখি যে, আমাদের পরিণামের ভাল ও মন্দ পুরোপুরি তাঁরই হাতে ন্যস্ত।

৬। اِيَّاكَ نَعْبُدُ - "আমরা তোমারই ইবাদত করি।"

আরবী ভাষায় ইবাদত শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১। পূজা ও উপাসনা করা, ২। আনুগত্য করা ও হুকুম মেনে চলা, ৩। বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে তিনটি অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার পূজা-উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার বন্দেগী ও দাসত্ব করি। এ সম্পর্কগুলো আমরা কেবল তোমার সাথেই রাখি। এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোন একটি অর্থেও অন্য কেউ আমাদের মা'বুদ নয়।

৭। وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - "এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল ইবাদতের নয়, বরং আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও তোমার সাথেই রয়েছে। আমরা জানি তুমিই সমগ্র বিশ্বজাহানের একমাত্র রব। সমস্ত শক্তি তোমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তুমি একাই যাবতীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহের অধিকারী। তাই আমাদের যাবতীয় অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা কেবল তোমারই নিকট ধর্ণা দেই, তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করি এবং তোমারই সাহায্যের উপর নির্ভর করি। আমাদের যাবতীয় সাহায্যের আবেদন নিয়ে আমরা বারবার তোমারই দুয়ারে হাজির হই।

৮। اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - "তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও।"

জীবনের গতিপথের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় ও প্রতিটি বিভাগে চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধিব্যবস্থা আমাদের শিখাও, যা হবে একেবারেই নির্ভুল। যে পথে চলে আমরা যথার্থ সফল ও সৌভাগ্যবান হতে পারি। কুরআন অধ্যয়নের পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাক্আতে দাঁড়িয়ে বান্দা নতজানু হয়ে প্রভুর নিকট আর্জি পেশ করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও। কল্পিত দর্শনের গোলকধাঁধার মধ্য থেকে যথার্থ সত্যকে উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।

৯। صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - "তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।"

সরল সোজা পথটির একটুখানি পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এমন পথ যার উপর সব সময় তোমার প্রিয়জনেরা চলেছেন। সেই নির্ভুল রাজপথটি, অতি প্রাচীন কাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি ও যে দলটি তার উপর চলেছে সে তোমার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে এবং তোমার দানে তার জীবনপাত্র পরিপূর্ণ হয়েছে।

১০। غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - "যাদের উপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।"

যারা চিরস্থায়ী সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথকে পরিহার করে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব

ধন-সম্পদ ,আরাম-আয়েশ ও আল্লাহর নাফরমানী কাজে জীবন অতিবাহিত করে তারা আল্লাহর গযব ও শাস্তির যোগ্য হয়; যেমন ইতিপূর্বে ফেরাউন, নমরূদ, শাদ্দাদ ও কারূন যেই গযবে পড়েছিল। আজও আমাদের চোখের সামনে বড় বড় যালেম, দুষ্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা আল্লাহর নাফরমানীর পথে চলে অভিশপ্ত হচ্ছে। হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে সে পথে পরিচালিত না করে তোমার রেজমন্দির পথে অর্থাৎ নবী, শহীদ, সিদ্দীক ও সালেহীনের পথে পরিচালিত করে আমাদের জীবনকে ধন্য কর, এ আমাদের প্রার্থনা।

শিক্ষা : ১। যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তার নিকট গিয়ে মুখ খুলেই প্রথমে নিজের প্রয়োজনটা পেশ করা সৌজন্য ও ভদ্রতার পরিচায়ক নয়; বরং প্রথমে দাতার গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তার দান, অনুগ্রহ ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়াই ভদ্রতার রীতি।

২। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিপালন করেন ও করুণা করেন, এজন্য আমরা তাঁকে ভালবাসি। আর তিনি ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করেন এজন্য আমরা তাঁকে ভয়ও করি এবং এই অনুভূতিও রাখি যে, আমাদের ভাল বা মন্দ পরিণাম পুরোপুরি তাঁরই হাতে ন্যস্ত। সেদিন তিনি শাস্তি প্রদান করলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না, আর পুরস্কার দিলেও কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৩। সঠিক পথে পরিচালিত করার একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। তাঁর মর্জি না হলে শত চেষ্টা করেও কোন মানুষ সঠিক পথ পেতে পারে না। তাই আমাদেরকে সরল পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে।

বাস্তবায়ন : আমাদের চাওয়া-পাওয়ার একমাত্র কেন্দ্রস্থল হলেন আল্লাহ। তিনি বিশ্বজাহানের মালিক, সর্বশক্তিমান। দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের ফলাফলই হবে আখেরাতের জীবনের পরিণাম। তাই দুনিয়ার জীবনকে কাজে লাগানোর জন্য একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে কায়েম করার চেষ্টায় আমরা সকলে আত্মনিয়োগ করি। এ আহ্বান রেখে এবং পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

দারস : ২

আখেরাত অবিশ্বাসীদের ভয়াবহ পরিণতি

১০৭. সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭, রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - (٢) فَذٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - (٣) وَلَايَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ - (٤) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ - (٥) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ - (٦) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ - (٧) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) তুমি কি তাকে দেখছো যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে? (২) সে-ই তো এতিমকে ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না। (৪) তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস, (৫) যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিলতি করে, (৬) যারা লোক দেখানো কাজ করে এবং (৭) মামুলি প্রয়োজনের জিনিসপাতি (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।

শব্দার্থ : أَرَيْتَ - তুমি কি দেখেছ। يُكَذِّبُ - অবিশ্বাস করে। بِالدِّيْنِ - আখেরাতের বিচারের দিনকে। ذٰلِكَ الَّذِى - সে-ই তো সেই ব্যক্তি। يَدُعُّ - ধাক্কা দেয়। يَتِيْمَ - এতিম। لَايَحُضُّ - উৎসাহিত করে না। طَعَامِ - খাদ্য। مِسْكِيْنَ - মিসকীন। وَيْلٌ - ওয়াইল (একটি দোযখের নাম), ধ্বংস। لِلْمُصَلِّيْنَ- নামাযীদের জন্য, নামায আদায়কারীদের জন্য। صَلَاتِهِمْ - তাদের নামাযে। سَاهُوْنَ - গাফেল, গুরুত্ব দেয় না। يُرَاءُوْنَ - লোক দেখানো।

يَمْنَعُوْنَ - দেয় না, মানা করে, বাঁধা দেয়। مَاعُوْنَ - ছোটখাট প্রয়োজনীয় জিনিস।

নামকরণ : শেষ আয়াতের শেষ مَاعُوْنَ শব্দটিকে এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মাউন শব্দের অর্থ ছোটখাট প্রয়োজনীয় জিনিস।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : পরকালের প্রতি ঈমান না থাকলে মানুষের মধ্যে কোন ধরনের নীতি নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। প্রথম তিন আয়াতে প্রকাশ্যে আখেরাত অবিশ্বাসী এবং শেষ চার আয়াতে মুনাফিক মুসলমানদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মূলত আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া প্রকৃত ঈমান ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ সত্যটি মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই হচ্ছে এ সূরার মূল উদ্দেশ্য।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে যুবাইরের উক্তির সাথে আতা ও জাবের (রা) একমত যে, সূরাটি মক্কী যুগে অবতীর্ণ। কিন্তু আবু হাইয়ান তাঁর বাহরুল মুহীত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও দাহ্হাকের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি মাদানী সূরা। এই সূরার মধ্যে এমন একটি আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য রয়েছে যা এর মাদানী হবার প্রমাণ পেশ করে। সেটি হচ্ছে, এ সূরায় এমন সব নামাযীদেরকে ধ্বংসের খবর শুনানো হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে গাফিলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। এ ধরনের মুনাফিক মদীনায় পাওয়া যেতো। কারণ ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীরা সেখানে এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করেছিল, যার ফলে বহু লোককে পরিস্থিতির তাগিদে ঈমান আনতে হয়েছিল এবং তাদের বাধ্য হয়ে মসজিদে আসতে হতো। তারা নামাযের জামায়াতে শরীক হতো এবং লোক দেখানো নামায পড়তো। এভাবে তারা মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতে চেষ্টা করতো। বিপরীতপক্ষে মক্কায় লোক দেখাবার মত নামায পড়ার কোন পরিবেশই ছিল না। লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তে হতো। প্রকাশ্যে নামায পড়লে প্রাণনাশেরও আশংকা থাকতো। সেখানে যে মুনাফিক ছিল তাদের লোক দেখানো ঈমান আনা বা লোক দেখানো নামায পড়ার প্রয়োজন হতো না। বরং তারা নবী করীম (সা)-কে সত্য নবী জানার পরও নিজেদের স্বার্থ,

শাসন ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী হতো না। আবার মুসলমানদেরকে বিপদ মুসিবত ও কঠোর নির্যাতনের মধ্যে নিমজ্জিত দেখে নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করে সেই মুসিবত কিনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। (আরও জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনকাবূতের ১৩-১৬ টীকা দেখুন)

ব্যাখ্যা : (ক) أَرَءَيْتَ। "তুমি কি দেখেছ?" এখানে বাহ্যত নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আসলে কুরআনের বর্ণনাভংগী অনুসারে সাধারণত এসব ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোকদেরকেই এ সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। সামনের দিকে লোকদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা চোখ দিয়ে দেখা, জানা, বুঝা ও চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। অর্থাৎ আমরা বলি, "আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে।" মানে আমাকে জানতে হবে। কাজই (أَرَءَيْتَ) আরাআইতা শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করলে আয়াতের অর্থ হবে, "তুমি কি জান বা ভেবে দেখেছো সেই ব্যক্তির অবস্থা, যে কর্মফলকে অবিশ্বাস করে?"

(খ) يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - এখানে "আদ্-দীন" শব্দটি দ্বারা আখেরাতের কর্মফল দিবস বুঝায়। দীন ইসলাম অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। আখেরাত অস্বীকারের আকীদা মানুষের মধ্যে যে ধরনের চরিত্র ও আচরণের জন্ম দেয় সেরূপ আচরণের কথা চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্যেই শ্রোতাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। এভাবে সে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার নৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

(গ) فَذٰلِكَ الَّذِىْ - এ বাক্যে "فَ" অক্ষরটি একটি সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ পেশ করে। এর অর্থ হলো, "যদি তুমি না জেনে থাকো তবে জেনে নাও।" সে তো "সেই ব্যক্তি" নিজের আখেরাত অস্বীকারের কারণে সে এমন এক ব্যক্তি যে–

(ঘ) يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. সে এতিমের হক মেরে খায় এবং তার পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। দুই. কোন এতিম তার নিকট সাহায্য চাইলে সে ধিক্কার দেয়। তারপরও যদি নিজের অসহায় ও কষ্টকর অবস্থার জন্য অনুগ্রহ লাভের

আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। তিন. কোন আত্মীয় এতিম যদি তার ঘরে থাকে তাহলে সারাটা বাড়ির লোকদের সেবাযত্ন করা, কথায় কথায় গালমন্দ খাওয়া ও লাথি ঝাঁটা খাওয়া ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু জুটে না। এই বাক্যে এ অর্থও নিহিত আছে যে, সে যে যুলুম করছে এ অনুভূতিও তার নেই, এ যুলুম করাটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। বড়ই নিশ্চিন্তে সে এ আচরণ করে যাচ্ছে। সে মনে করে, এতিম একটা অক্ষম অসহায় জীব। তার উপর নির্যাতন চালালে, তার হক মেরে খেলে, সে সাহায্য চাইলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দিলে এমন কিছু আসে যায় না।

এ প্রসঙ্গে কাজী আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী তাঁর "আলামুন নুবুওয়াহ" কিতাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক এতিম ছেলের অভিভাবক ছিল আবু জেহেল। ছেলেটি একদিন খালি গায়ে তার কাছে এসে তার পৈত্রিক সম্পদ থেকে কিছু দিতে তাকে অনুরোধ করলো। কিন্তু যালেম আবু জেহেল তার কথায় কানই দিল না। এতিম ছেলেটি অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। কুরাইশ সরদাররা তামাশা করে বললো, "যা, মুহাম্মদের (সা) কাছে গিয়ে নালিশ কর। সে আবু জেহেলের কাছে সুপারিশ করে তোর সম্পদ তোকে দেবার ব্যবস্থা করবে।" ছেলেটি তাদের এ তামাশার কি বুঝবে। সে সোজা নবী করিম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার অবস্থার বর্ণনা দিল। তার ঘটনা শুনে নবী করিম (সা) সাথে সাথে দাঁড়িয়ে তাকে সাথে নিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম শত্রু আবু জেহেলের নিকট চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল অভ্যর্থনা জানালো। তারপর যখন তিনি বললেন, এ ছেলেটির হক একে ফিরিয়ে দাও, তখন সে সাথে সাথে তাঁর কথা মেনে নিল এবং ছেলেটির ধন-সম্পদ এনে তার সামনে রেখে দিল।

ঘটনার পরিণতি কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সরদাররা ওঁৎ পেতে বসে আছে। তারা ভেবেছিল, দু'জনের মধ্যে বেশ একটা মজার কলহ জমে উঠবে। কিন্তু এ অবস্থা দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। তারা আবু জেহেলের কাছে এসে বলতে লাগলো, তুমিও নিজের ধর্মত্যাগ করেছো। আবু জেহেল জবাব দিল, আল্লাহর কসম! আমি ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু আমি অনুভব

করলাম মুহাম্মদের (সা) ডানে ও বাঁয়ে এক একটি অস্ত্র রয়েছে। আমি তাঁর ইচ্ছার সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করলে সেগুলো সোজা আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যাবে।

এ ঘটনা থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় না যে, সে যুগে আরবের সবচেয়ে বেশী উন্নত ও মর্যাদাশালী গোত্রের বড় বড় সর্দারগণ পর্যন্ত এতিম অসহায় ও সম্বলহীন লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতো, বরং একই সংগে একথাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুদের উপরও তাঁর এ চারিত্রিক প্রভাব কতটুকু কার্যকর ছিল। তাফহীমুল কুরআন সূরা আল-আম্বিয়া ৫ টীকায় এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। এ কারণে কুরাইশরা তাঁকে যাদুকর বলতো।

(ঙ) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ - "মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত বা উদ্বুদ্ধ করে না।" নিজেকে, পরিবারের লোকদেরকে ও অন্যদেরকে মিসকীনের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।

এখানে মহান আল্লাহ তায়ালা আখেরাত অবিশ্বাস করলে যে অসংখ্য দোষ ত্রুটির জন্ম হয় তার মধ্য থেকে নমুনাস্বরূপ এমন দু'টি দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যক্তি যদি আখেরাতে বিশ্বাস, আল্লাহর সামনে নিজের উপস্থিতি ও নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহির স্বীকৃতি দিতো তাহলে এতিমের হক মেরে খাবার, তার উপর যুলুম-নির্যাতন করার, তাকে ধিক্কার দেবার এবং মিসকীনকে খাবার না দেবার ও অন্যকে দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মত নিকৃষ্টতম কাজ সে করতো না। আখেরাত বিশ্বাসীদের গুণাবলী সূরা আসর ও সূরা বালাদে বলা হয়েছে। বালাদে বলা হয়েছে- وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ - "আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা করার জন্য তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়।" সূরা আসরে বলা হয়েছে- وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ - "তারা পরস্পরকে সত্যপ্রীতি ও অধিকার আদায়ের উপদেশ দেয়"।

আর মিসকীনকে যে খাবার দেয়া হয় তা দাতার খাবার নয়, বরং তা ঐ মিসকীনেরই হক এবং দাতার উপর এ হক আদায় করার দায়িত্ব বর্তায়। কাজেই দাতা এ খাদ্য মিসকীনকে দান করছে না বরং মিসকীনের হক

আদায় করছে। সূরা আয্‌যারিয়াতে ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - "আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিখারী ও বঞ্চিতদের হক।"

(চ) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - "ঐসব নামাযীদের জন্য ধ্বংস" যারা নামায পড়ে মুসলমানদের সাথে সামিল হওয়া সত্ত্বেও আখেরাত বিশ্বাস করে না।

সেসব মুনাফিক নিজেদের কেমন ধ্বংসে সরঞ্জাম তৈরী করছে?

(ছ) عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ - "তারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন।" নামায আদায় করা না করায় কোন পার্থক্য বা গুরুত্ব তাদের দৃষ্টিতে নেই। তারা কখনও নামায আদায় করে আবার কখনও করে না। যখন ইচ্ছা আদায় করে। সময় যখন শেষ হয়ে আসে তখন উঠে গিয়ে চারটে ঠোকর দিয়ে আসে। নামাযের জন্য উঠে কিন্তু একেবারে যেন উঠতে মন চায় না এমনভাবে উঠে। নামায পড়ে নেয় কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। যেন কোন আপদ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নামাযে কাপড় নিয়ে খেলা করতে থাকে। হাই তুলতে থাকে। আল্লাহ্‌র স্মরণ সামান্যতমও তাদের মধ্যে থাকে না।

সারাটা নামাযের মধ্যে একটুও এ অনুভূতি আসে না যে, তারা নামায পড়ছে। নামাযের মধ্যে তারা কি পড়ছে তাও তাদের খেয়াল থাকে না। নামায পড়তে থাকে এবং মন অন্যত্র হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকে, অন্য সময় হিসাব মিলে না কিন্তু নামাযের মধ্যে মিলে যায়। প্রথম রাক্‌আতে কোন সূরা পড়া হয়েছে দ্বিতীয় রাক্‌আতের সময় মনে থাকে না। ঘন ঘন কিয়াম, রুকূ ও সিজদা দিয়ে নামায পড়ার একটা ভান করে, দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করে। আবার দেখা যায় কোন বেনামাযী নামাযীদের পরিবেশে কোন প্রয়োজনে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে বেকায়দায় পড়ে নামায পড়ে। আসলে তাদের জীবনে এ নামাযের কোন মূল্য নেই। দৈনিক পাঁচবার মুয়ায্‌যিনের আযানের আওয়ায কানে আসে; কিন্তু তিনি কিসের আহ্বান জানাচ্ছেন, কাকে এবং কেন এ আহ্বান, একথাটা কি তারা একবারও চিন্তা করে না? এটাই আখেরাতের প্রতি ঈমান না থাকার আলামত।

তথাকথিত ইসলামের দাবীদাররা নামায পড়লে কোন পুরস্কার পাবে বলে

মনে করে না এবং না পড়লে শাস্তিভোগ আছে এ কথা বিশ্বাস করে না। এ কারণে তারা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এইজন্য হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ও হযরত আতা ইবনে দীনার বলেন : আল্লাহর শোকর তিনি "ফী সালাতিহিম সাহূন" বলেননি, বরং "আন সালাতিহিম সাহূন" বলেছেন। অর্থাৎ আমরা নামাযে ভুল করি ঠিকই কিন্তু নামায থেকে গাফেল হই না। এজন্য মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবো না।

কুরআন মজীদে সূরা তওবার ৫৪ আয়াতে মুনাফিকরদের অবস্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلاَّ وَهُمْ كُسَالٰى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ.

"তারা যখনই নামাযে আসে অবসাদগ্রস্তের মতো আসে এবং যখনই (আল্লাহর পথে) খরচ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

تلك صلوة المنافق تلك صلوة المنافق تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكرالله فيها الا قليلا -

"এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে আসরের সময় বসে সূর্যকে দেখতে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দুটো শিংয়ের মাঝখানে পৌছে যায় (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে নেয়। তাতে আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করা হয়।" (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা, আর নামাযের প্রতি কখনও দৃষ্টি না দেয়া এবং নামায পড়তে পড়তে সর্বদা অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথম অবস্থাটি মানবিক দুর্বলতার স্বাভাবিক দাবী। ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই অন্যান্য চিন্তা এসে যায় এবং নামাযী যখন অনুভব করে তার মন নামায থেকে অন্য দিকে চলে গেছে, ঠিক তখনই সে চেষ্টা করে আবার নামাযে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় অবস্থাটি নামাযে গাফিলতি করার পর্যায়ভুক্ত। কেননা এ অবস্থায় মানুষ শুধুমাত্র নামাযে ব্যায়াম করে। আল্লাহকে স্মরণ করার কোন ইচ্ছা

তার মনে জাগে না। নামায শুরু করা থেকে নিয়ে সালাম ফেরানো পর্যন্ত একটা মুহূর্তও তার মন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেসব চিন্তা মাথায় পুরে সে নামাযে প্রবেশ করে তার মধ্যেই সব সময় ডুবে থাকে।

(জ) اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ - "যারা লোক দেখানো কাজ করে।" প্রথম নজরেই টের পাওয়া যায় যে আগের বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : "এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা লোক দেখানো নামায পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামায পড়তো নতুবা পড়তো না।" অন্য একটি রেওয়ায়াতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, "একাকী থাকলে পড়তো না, আর সর্বসমক্ষে পড়ে নিতো।" (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী ফিশ্ শু'আব)

কুরআন মজীদেও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে–

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً -

"আর যখন তারা নামাযের জন্য উঠে অবসাদগ্রস্তের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে খুব কমই।" (আন-নিসা : ১৪২)

(ঝ) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ - "এবং মামুলি প্রয়োজনের জিনিসপাতি (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।"

আসলে মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে কোন ফায়দা অর্জন করতে পারে। এ অর্থে যাকাতও মাউন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসাবে গরীবদের সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। আর এই সংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর সমমনা লোকেরা অন্যান্য যেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোও মাউন। অধিকাংশ তাফসীরকার মত পোষণ করেন যে, সাধারণত প্রতিবেশীরা একে অপরের নিকট থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজনে যেসব জিনিষ চেয়ে নেয় সেইগুলো মাউনের অন্তর্ভুক্ত। এ জিনিসগুলো চেয়ে নেয়া

কোন অপমানজনক বিষয় নয়। কারণ ধনী-গরীব কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এ ধরনের জিনিস অন্যকে দেবার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। এ পর্যায়ের অধিকাংশ জিনিস অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং প্রতিবেশীরা নিজেদের কাজে সেগুলো ব্যবহার করে। কাজ শেষ হয়ে গেলে অবিকৃত অবস্থায়ই সেগুলো ফেরত দেয়া হয়।

এখানে আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আখেরাত অবিশ্বাসী মানুষকে এত বেশী সংকীর্ণমনা করে তোলে যে, সে অপরের জন্য সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজী হয় না।

শিক্ষা : ১। আখেরাত অবিশ্বাসী ব্যক্তির আল্লাহর ভয় থাকে না, তাই সে যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

২। খোদাদ্রোহী ব্যক্তিরাই এতিমের হক আত্মসাৎ করে এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।

৩। মুনাফিকরাই নামাযে অলসতা করে এবং লোক দেখানো কাজ করে।

৪। কর্মফলের প্রতি অবিশ্বাস মানুষকে সংকীর্ণমনা করে বলেই তারা ছোটখাট মামুলী জিনিস দিয়ে প্রতিবেশীকে সহায়তা করে না।

বাস্তবায়ন : আমরা যেন তাক্ওয়া অর্জন করে আখেরাতের উপর ঈমান রেখে ও প্রতিবেশীর হক আদায় করে পূর্ণ ঈমানদার হিসাবে আল্লাহর বন্দেগী করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে আমার দারস শেষ করছি। আমিন। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৩

ধ্বংসে নিমজ্জিত মানুষের বাঁচার উপায়

১০৩. সূরা আল-আসর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৩, রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) وَالْعَصْرِ ـ (٢) اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ـ (٣) اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ـ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "সময়ের কসম! (২) মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। (৩) তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করছে এবং একে অপরকে হক ও সবরের উপদেশ দিচ্ছে।"

শব্দার্থ : اَلْعَصْرِ - সময়, কাল বা আয়ু। اِنَّ - নিশ্চয়, اِنْسَانٌ - মানুষ। ل - অবশ্যই। فِىْ - মধ্যে। خُسْرٍ - ক্ষতি বা ধ্বংস। اِلاَّ - ব্যতীত, اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছে। عَمِلُوْا - আমল করেছে, اَلصّٰلِحٰتِ - সৎকর্ম। تَوَاصَوْا - পরস্পরকে উপদেশ দেয়, بِالْحَقِّ - ন্যায় বা সত্যের। بِالصَّبْرِ - ধৈর্য বা সবরের।

নামকরণ : সূরাটির প্রথম শব্দ اَلْعَصْرِ (আসর)-কে এর নামরূপে গণ্য করা হয়েছে। আসর অর্থ সময় বা কাল। মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য যে কয়টি কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো সময় বা কালের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই সূরাটির বিষয়বস্তুর সাথে নামের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : ধ্বংসে নিমজ্জিত মানুষকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অতি অল্প কথায় ও সংক্ষেপে যে পথনির্দেশ এ সূরাতে দেয়া হয়েছে,

এমন আর দ্বিতীয়টি নেই। মানুষের সাফল্য ও কল্যাণ বয়ে আনার জন্য এই একটি মাত্র সূরার আমলই যথেষ্ট। সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। সাহাবাগণ পরস্পর মিলিত হলে একে অপরকে সূরা আসর না শুনিয়ে বিদায় নিতেন না। (তাবারানী)

নাযিল হওয়ার সময়কাল : মুজাহিদ, কাতাদা ও মুকাতিল এই সূরাকে মাদানী বলেছেন। কিন্তু মুফাস্সিরগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মাক্কী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা হিসাবে গণ্য করেছেন। সে সময়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে তুলে ধরা হতো। শ্রোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারতো না। আপনা আপনিই লোকদের মুখে মুখে তা উচ্চারিত হতে থাকতো। মাক্কী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাগুলোর সমস্ত বৈশিষ্ট এ সূরাতে বিদ্যমান। তাই সূরাটি যে মাক্কী এবং প্রথম পর্যায়ের সূরা এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ব্যাখ্যা : আলোচনার বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই কসম খাওয়া হয়েছে। কারণ কসমের বিষয়বস্তুর মধ্যেই আলোচনার বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রমাণ নিহিত আছে। আল্লাহ তায়ালা সময়ের যে কসম করেছেন তার অর্থ হলো, যাদের মধ্যে (১) ঈমান, (২) সৎকাজ, (৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) একে অপরকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়া, এই চারটি গুণ রয়েছে তারা ব্যতীত বাকী সমস্ত মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, সময় এর প্রমাণ।

وَالْعَصْرِ -এর প্রথম অক্ষর و শপথের জন্য, একে "ওয়াও কাসমিয়া" বলা হয়। আসর দ্বারা সময় বা কাল বুঝায়। অতীত কালও হতে পারে আবার বর্তমান কালও হতে পারে। সাইকেলের চাকার মতো ঘূর্ণায়মান প্রতিটি ভবিষ্যত মুহূর্তকে বর্তমান এবং বর্তমানকে অতীত বানিয়ে দেয়। কালের যে অংশটা এখন চলছে তা আসলে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিটি জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সময় বা সুযোগ।

পরীক্ষার হলে একজন ছাত্রকে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার জন্য যে সময় বেঁধে

দেয়া হয় সে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগায়। ফলে সে ভাল ফল নিয়ে উত্তীর্ণ হয়।

ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার প্রতি লক্ষ্য করলে সময়ের দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হওয়া টের পাওয়া যাবে। অথচ একটি সেকেণ্ডও সময়ের একটি বিরাট অংশ। এক সেকেণ্ডে আলো এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল অতিক্রম করে। আমাদের জানার বাইরে এমন কিছুও থাকতে পারে যা আলোর গতি থেকে আরও দ্রুত গতিসম্পন্ন। আল্লাহ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের হায়াত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই নির্দিষ্ট সময়টাই আমাদের আসল মূলধন। পরীক্ষার্থীর মত সেই মূলধনের প্রতিটি সেকেণ্ডকে যদি আমরা কল্যাণকর ও সঠিক কাজে লাগাই তাহলে আমরাও সফলতার মাধ্যমে আখেরাতের মহাধ্বংস থেকে রক্ষা পাব।

ইমাম রাযী এ ব্যাপারে একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন : "এক বরফ বিক্রেতা বাজারে জোর গলায় হেঁকে বলছিল, দয়া কর এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। তার কথা শুনে আমি বললাম, وَالْعَصْرِ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ বাক্যের আসল অর্থ হচ্ছে এটিই। মানুষকে যে আয়ুষ্কাল নামক মূলধন দেয়া হয়েছে তা বরফ গলার মত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই মূলধন যদি ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই হবে মানুষের চরম ক্ষতি।" এই চারটি গুণশূন্য মানুষ যে কাজই করে তার সবটুকুই ক্ষতির সওদা। এই চার গুণে গুণান্বিত মানুষেরাই লাভবান।

এ চারটি গুণ যদি কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে না থাকে তাহলে এরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়। বিষ মানুষের জন্য ধ্বংসকর। এক ব্যক্তি খেলে, একটি জাতি খেলে বা সারা দুনিয়ার মানুষ সবাই মিলে খেলেও বিষের ধ্বংসকর ও সংহারক গুণ অপরিবর্তনীয় থাকবে। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য চারটি গুণশূন্য হওয়া যে ক্ষতির কারণ, এটিও একটি ধ্রুব সত্য। কোন ব্যক্তি এই গুণাবলীশূন্য হোক অথবা কোন জাতি বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা কুফরী করা, অসৎকাজ করা

এবং বাতিল কাজে উৎসাহিত করা ও নফসের বন্দেগী করার উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে যাক তাতে এই মূলনীতিতে কোন পার্থক্য বা পরিবর্তন সৃষ্টি হয় না।

দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে যে চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে তাহলো : (১) ঈমান, (২) সৎকাজ, (৩) ন্যায় বা হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) পরস্পরকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেয়া। এ চারটি কাজের মধ্যে প্রথম দু'টি কাজ ব্যক্তিগত মান উন্নয়ন। অপর দু'টি সমাজ সংশোধনমূলক।

ব্যক্তিগত দু'টি কাজের প্রথমটি হলো : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - "যারা ঈমান আনে।" ঈমানের উপাদান হলো তিনটি : (১) তাসদীক বিল-জিনান- অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, (২) ইকরার বিল-লিসান- মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং (৩) আমাল বিল-আরকান- বাস্তবে কাজে পরিণত করা।

ঈমানের প্রধান ও মূল বিষয় হলো তিনটি।

১। **তাওহীদে বিশ্বাস** : আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নাই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক, তিনি রিযিকদাতা, আইনদাতা, সকলের লালন-পালনকারী, বিপদে আশ্রয়দাতা, ইবাদত-বন্দেগী পাবার অধিকারী। ভাগ্য নির্ধারণের মালিক তিনিই। তাঁর উপরই ভরসা, তাঁকে ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না ইত্যাদি।

২। **রিসালাতে বিশ্বাস** : নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও আসমানী কিতাব এই তিনের সমন্বয়ে রিসালাত। অর্থাৎ জিবরাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূলগণের উপর আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে।

৩। **আখেরাতে বিশ্বাস** : মৃত্যুর পর যে জীবন আরম্ভ হয়, যেমন কবর, হাশর, কিয়ামত, লাওহ-কলম, আমলনামা, মিজান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির সমন্বয়ে আখেরাত। এসব বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার নামই হলো ঈমান।

ঈমান সম্পর্কে সূরা আস-সফ-১১ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ـ

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জানপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করো।"

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا ـ

"মুমিন তো আসলে তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, তারপর কোন সংশয়ে লিপ্ত হয় না।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৫)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ـ

"আসলে তারাই মুমিন, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের দিল কেঁপে উঠে।" (সূরা আনফাল : ২)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا ـ

"যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব, তারপর তার উপর অবিচল হয়ে আছে।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্ : ৩০)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ও অত্যন্ত মযবুতির সাথে ভালবাসে।" (সূরা বাকারা : ১৬৪)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো।" (সূরা নিসা : ১৩৬)

এখানে ঈমানদারগণকে আবার ঈমান আনার জন্য তাগিদ দেয়ার তাৎপর্য হলো, প্রকৃত ও মযবুত ঈমান, মৌখিক স্বীকারোক্তি মাত্র নয়।

উল্লিখিত ছয়টি আয়াতে প্রকৃত ও মযবুত ঈমানের উপর জোর দেয়া হয়েছে। ঈমান আনার পর আর কোন সন্দেহ সংশয় পোষণ করা যাবে না। যাদের

মধ্যে এ রকম মযবুত ঈমান নেই তারা আখেরাতের মহাধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

ব্যক্তিগত দ্বিতীয় কাজটি হলো : وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - নেক আমল। সমস্ত সৎকাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই তা কোন সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎ কাজের পূর্বে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। মানুষ নিজের কাজের সাহায্যে যে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করে সেটিই হয় নির্ভরযোগ্য ও কল্যাণকর ঈমান। ঈমান ও সৎ কাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ব্যতীত অপরটির কোন মূল্য নেই। ঈমান ও সৎ কাজের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের মতো। বীজ মাটির মধ্যে না থাকা পর্যন্ত কোন বৃক্ষ জন্মাতে পারে না। যদি বীজ মাটির মধ্যে থাকে কিন্তু কোন বৃক্ষ জন্মায় না তাহলে বুঝতে হবে বীজ মাটির ভিতর পঁচে গেছে। কাজেই ঈমান আনার পর সৎ কাজ করতে হবে। সৎ কাজ ছাড়া কেবল ঈমান মানুষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে না।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً -

"মুমিন হয়ে পুরুষ অথবা মহিলা যে কেউ সৎ কর্ম করবে তাকে আমি অবশ্যই আনন্দের জীবন দান করবো।" (সূরা আন-নাহ্ল : ৯৭)

আনন্দের জীবন পাওয়ার জন্যই দুনিয়ার মানুষ পাগল। কিন্তু কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে আনন্দের জীবন লাভ করা যায়, সেই আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে রাযী নয়। শয়তানের দেয়া পদ্ধতিতে প্রকৃত ও স্থায়ী আনন্দের জীবন লাভ করা যায় না। তাই আল্লাহ্র হেদায়াত অনুযায়ী আমরা ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে আনন্দময় জীবন লাভ করার চেষ্টা করবো।

তৃতীয় কাজ : وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ - "একে অপরকে হক ও সত্যের উপদেশ দিবে।" এ কাজটি সামাজিক পর্যায়ের। নিজে শুধু ঈমানদার ও নেক আমলের অধিকারী হলেই চলবে না, বরং ঈমানের দাবী পূরণের জন্য সমাজের অন্যান্য লোককেও সত্য ও হক পথে চলার আহ্বান জানাতে হবে।

গোটা সমাজকে ঈমানের ভিত্তিতে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী করে গড়ে তোলার জন্য সমাজের একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এ কাজটি কারো একার দায়িত্ব নয়। সমাজে বসবাসকারী সকলেরই দায়িত্ব। এ কাজটিই সমাজকে নৈতিক পতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। যারা নিজেদের সমাজে হককে বিধ্বস্ত হতে দেখে নীরব থাকবে, তারাও একদিন এ ক্ষতিতে নিমজ্জিত হবে। সূরা মাইদায় বলা হয়েছে :

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاودَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

"দাউদ ও ঈসা ইবনে মরিয়াম-এর মুখ দিয়ে বনী ইসরাঈলদের উপর লানত করা হয়েছে। আর এই লানতের কারণ ছিল, তাদের সমাজে গুনাহ ও যুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকতো।" (সূরা মাইদা : ৭৮-৭৯)

সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে : "বনী ইসরাঈলরা যখন প্রকাশ্যে শনিবারের বিধান অমান্য করে মাছ ধরতে শুরু করে তখন তাদের উপর আযাব নাযিল হয় এবং সেই আযাব থেকে একমাত্র তাদেরকেই বাঁচানো হয় যারা লোকদের এই গুনাহর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করে।" (১৬৩-১৬৬ আয়াত)

সূরা আনফালে আবার একথাটি এভাবে বলা হয়েছে : "তোমরা সেই ফিতনা থেকে নিজদের রক্ষা করো যার ক্ষতিকর প্রভাব শুধুমাত্র সেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গুনাহ করেছে।" (২৪ আয়াত)

এজন্যই কালামে পাকে বারবার তাকীদ করা হয়েছে : "তা'মুরূনা বিল-মা'রূফে ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার।" (সৎ কাজে আদেশ কর আর অসৎ কাজে বাধা দাও)। এ কাজটি উম্মতে মুসলিমার দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। (দ্র. সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

সেই উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বলা হয়েছে, যারা এ দায়িত্ব পালন করে। (দ্র: আলে ইমরান : ১১০)

চতুর্থ কাজ : وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ - "পরস্পর ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিচ্ছে।" সমাজে হক ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এ পথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ-আপদ, ক্ষতি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, চোখ রাঙ্গানী নিরন্তর পীড়িত করে তার মুকাবিলায় তারা পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশ্ত করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ "যারা পরস্পরকে সবর ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) রহম করার উপদেশ দেয়।" এই সমাজের সদস্যরা পরস্পরকে সবর করার, রহম ও স্নেহার্দ্র ব্যবহারের উপদেশ দান করবে। কুরআন মজীদ যে ব্যাপক অর্থে এ সবরের ব্যবহার করেছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে মুমিনের সমগ্র জীবনকেই সবরের জীবন বলা যায়। ঈমানের পথে পা রাখার সাথে সাথেই মানুষের সবরের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ যেসব ইবাদত ফরয করেছেন, সেগুলো সম্পাদন করতে গেলে সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ও সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যও সবরের দরকার। আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন, সবরের সাহায্য ছাড়া সেগুলো থেকে রেহাই পাওয়াও কঠিন। নৈতিক অসৎবৃত্তি পরিহার করা ও সৎবৃত্তি অবলম্বন করার জন্য সবরের প্রয়োজন। প্রতি পদে গুনাহ মানুষকে প্ররোচিত করে। তার মুকাবিলা করা সবর ছাড়া সম্ভব নয়।

জীবনে এমন বহু সময় আসে যখন আল্লাহর আইনের আনুগত্য করলে বিপদ-আপদ, কষ্ট, ক্ষতি ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়। আবার এর বিপরীতে নাফরমানীর পথ অবলম্বন করলে লাভ, ফায়দা, আনন্দ ও ভোগের পেয়ালা উপচে পড়তে দেখা যায়। সবর ছাড়া কোন মুমিন এ পর্যায়েগুলো

নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারে না। তারপর ঈমানের পথ অবলম্বন করতেই মানুষ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। নিজের সন্তান-সন্ততির, পরিবারের, সমাজের, দেশের, জাতির ও সারা দুনিয়ার মানুষ ও জিন শয়তানদের বিরোধিতার মুকাবিলা করে টিকে থাকতে হয়। এমনকি তাকে আল্লাহর পথে হিজরত ও জিহাদও করতে হয়। এসব অবস্থায় একমাত্র সবরের গুণই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, একজন মুমিন একা একা যদি এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহলে তার সব সময় পরাজিত হওয়ার ভয় থাকে। অতি কষ্টে হয়তো সে কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে। বিপরীতপক্ষে যদি মুমিনদের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার প্রত্যেক সদস্য সবরকারী হয় এবং এই সমাজের সদস্যরা সবরের এই ব্যাপকতর পরীক্ষায় পরস্পরকে সাহায্য-সহায়তা দান করতে থাকে তাহলে সাফল্যের পর সাফল্য এই সমাজের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। সেখানে পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সীমাহীন শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হবে।

উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগত দু'টি ও সামষ্টিক বা সামাজিকভাবে দু'টি মোট চারটি গুণ যদি কারো মধ্যে না থাকে তবে সে নিশ্চিতভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের চরম ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

শিক্ষা : সম্মানিত উপস্থিতি, আল-কুরআনের এই ছোট সূরা আল-আসরের বিস্তারিত আলোচনার পর যে সকল শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি তা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

◆ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সময়টা আমাদের আসল মূলধন। এ মূলধনের প্রতিটি মুহূর্তকে অতি মূল্যবান মনে করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যয় করতে হবে। এ মূল্যবান মূলধনের কোন একটি ক্ষুদ্রতম অংশও আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যয় করা যাবে না।

◆ দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের কল্যাণের চেয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে অধিক কল্যাণময় করে গড়ে তোলার জন্য দু'টি ব্যক্তিগত ও দু'টি সামাজিক কাজ করতে হবে।

ব্যক্তিগত কাজ দু'টি হলো : (১) মযবুত ঈমানদার হতে হবে। (২) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যয় করতে হবে।

সামাজিক কাজ দু'টি হলো : (১) সমাজে হক ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাতিল শক্তির মুকাবিলা করতে হবে। (২) এ বাতিল শক্তির মুকাবিলা করতে গিয়ে যত প্রকারের দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন আসুক তাতে টিকে থাকার জন্য ধৈর্যধারণ ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার জন্য উৎসাহ ও উপদেশ দিতে হবে।

◆ উল্লিখিত শিক্ষাগুলো আমল করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সার্বক্ষণিক দু'আ ও সাহায্য কামনা করতে হবে।

বাস্তবায়ন : অনন্ত আখেরাতের মহা ধ্বংস জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে সূরা আসরের শিক্ষানুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানিয়ে এবং মহান দয়াময় আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করে এখানেই দারস শেষ করছি। আমীন। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৪

অধিক সম্পদ লাভের মোহ

১০২. সূরা আত-তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৮, রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(١) اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ - (٢) حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - (٣) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - (٤) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - (٥) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - (٦) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ - (٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ - (٨) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) তোমাদেরকে বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় অধিক সুখ-সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফলতির মধ্যে ফেলে রেখেছে। (২) এমনকি (এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও। (৩) কখনও নয়, অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪) আবার (শুনে নাও) কখনো নয়, অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কখনো নয় তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এই আচরণের পরিণাম) জানতে (তবে তোমরা এ ধরনের কাজ করতে না)। (৬) অচিরেই তোমরা জাহান্নাম দেখবে। (৭) আবার শুনো তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে প্রত্যক্ষভাবে সেটি দেখতে পাবে। (৮) তারপর সেদিন তোমাদের এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

শব্দার্থ : اَلْهٰكُمْ - শব্দটির মূলে لَهْوٌ-এর আসল অর্থ গাফলতি। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল হয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়া। اَلتَّكَاثُرُ - শব্দটি মূলে كَاثِرَةٌ - বেশী, অধিক। অপরের তুলনায় অধিক প্রাচুর্য লাভ করার চেষ্টা করা। حَتّٰى - যে পর্যন্ত। زُرْتُمْ - তোমরা

পৌঁছে যাও। مَقَابِرَ - কবর, كَلَّا - কখনো নয়। سَوْفَ- শীঘ্রই, অচিরেই, تَعْلَمُوْنَ - তোমরা জানবে। ثُمَّ - আবার, عِلْمَ - জ্ঞান, الْيَقِيْنِ - নিশ্চিত বিশ্বাস, لَتَرَوُنَّ - তোমরা দেখবে, جَحِيْمَ - দোযখ, জাহান্নাম (একটি দোযখের নাম)। عَيْنَ- চক্ষু, لَتُسْئَلُنَّ - অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। يَوْمَئِذٍ - সেদিন, عَنِ - সম্পর্কে, সম্বন্ধে। النَّعِيْمِ - নিয়ামত।

নামকরণ : এ সূরার প্রথম আয়াতের আত্-তাকাছুর (اَلتَّكَاثُرُ) শব্দটিকে সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আত্-তাকাছুর অর্থ অধিক, বেশী মাত্রা।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : এ সূরায় মানুষকে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজারী অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এ ভালবাসা ও স্বার্থপূজার কারণে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী ধন-সম্পদ আহরণ, পার্থিব লাভ, স্বার্থ উদ্ধার, ভোগবিলাস, প্রতাপ, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ এবং তার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে একজন আর একজনকে টপকে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং এসব অর্জন করার ব্যাপারে অহংকারে মেতে উঠে। এই একটি মাত্র চিন্তা তাদেরকে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যার ফলে এর চেয়ে উন্নত কোন জিনিসের প্রতি নজর দেবার মানসিকতাই তাদের নেই। যেসব নিয়ামত তোমরা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, এগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষা। প্রতিটি নিয়ামত সম্পর্কে আখেরাতে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : আবু হাইয়ান ও শাওকানী বলেন, সকল তাফসীরকার একে মাক্কী সূরা গণ্য করেছেন। ইমাম সুয়ূতীর বক্তব্য হচ্ছে, মক্কী সূরা হিসাবেই এটি বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু কিছু কিছু বর্ণনায় একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। যেমন ইবনে আবু হাতেম আবু বুরাইদার (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : বনী হারেসা ও বনিল হারস নামক আনসারদের দু'টি গোত্রের ব্যাপারে এ সূরাটি নাযিল হয়। উভয় গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রথমে নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করে। তারপর কবরস্থানে

গিয়ে মৃত লোকদের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করে। তাদের এ আচরণের ফলে اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ নাযিল হয়। কিন্তু শানে নুযূলের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সামনে রাখলে এ রেওয়ায়াত যে উপলক্ষে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে এ সূরা নাযিলের উপলক্ষ বলে মেনে নেবার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বরং এ থেকে এ অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, এ দু'টি গোত্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সূরাটি খাপ খেয়ে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন : "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ বাণীটিকে কুরআনের মধ্যে মনে করতাম।

لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَّالٍ لَتَمَنّٰى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَاُ جُوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابَ -

"বনী আদমের যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকা দাবী করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরে না।"

এমনকি শেষ পর্যন্ত আলহাকুমুত তাকাছুর সূরাটি নাযিল হয়।" হযরত উবাই (রা) মদীনাতে মুসলমান হয়েছেন বলে এই হাদীসকে সূরা আত্-তাকাছুরের মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়। কিন্তু হযরত উবাইয়ের এই বক্তব্য থেকে সাহাবায়ে কেরাম কোন অর্থে রাসূলের এ বাণীকে কুরআনের মধ্যে মনে করতেন তা সুস্পষ্ট হয় নাই। যদি তাঁরা একে কুরআনের একটি আয়াত মনে করতেন তাহলে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে না। কারণ সাহাবীগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কুরআনের প্রতিটি হরফ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ হাদীসকে কুরআনের আয়াত মনে করার মত ভুল ধারণা তাঁরা কেমন করে পোষণ করতে পারেন? মদীনা তাইয়েবায় যারা মুসলমান হয়েছেন তাঁরা নবী করীম (সা)-এর পক্ষে পাক মুখে প্রথম এ সূরাটি শুনে মনে করেছেন, এইমাত্র

বুঝি সূরাটি নাযিল হয়েছে। কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করেও মাক্কী মাদানীর মতানৈক্য দেখা দিয়েছে।

সকল মতানৈক্যের অবসান ঘটিয়ে মুফস্‌সিরগণের অধিকাংশই এই সূরাটি মক্কী হওয়ার ব্যাপারে একমত। বিশিষ্ট তাফসীরকার সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী (রহ)-এর মতে এটি শুধু মক্কী সূরাই নয়, বরং মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা : اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ - "তোমাদেরকে বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় অধিক দুনিয়ার স্বার্থ লাভের মোহ গাফলতির মধ্যে ফেলে রেখেছে।"

اَلْهٰكُمْ - শব্দটির মূলে রয়েছে লাহউন। لَهْوٌ-এর আসল অর্থ গাফলতি। যেসব কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ এত বেশী বেড়ে যায় যে, সে তাতে মগ্ন হয়ে অন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফের হয়ে পড়ে। সে ধরনের প্রতিটি কাজের জন্য আরবী ভাষায় এ শব্দটি বলা হয়ে থাকে।

তাকাছুর (تَكَاثُرُ)-এর মূল কাছরাত (كَثْرَتٌ)। কাছরাত অর্থ দুনিয়ার প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। আলহাকুম-এ কাদের সম্বোধন করা হয়েছে এ বাক্যে সে কথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থের এ অস্পষ্টতার কারণে এ শব্দগুলোকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহারের দুয়ার খুলে দিয়েছে। তাই দুনিয়ার সমস্ত সুবিধা ও লাভ, বিলাসদ্রব্য, ভোগের সামগ্রী, শক্তি ও কর্তৃত্বের উপকরণ বেশী বেশী অর্জন করার চেষ্টা চালানো, এগুলো অর্জন করার জন্য একে অন্যের থেকে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করা এবং এগুলোর প্রাচুর্যের কারণে অন্যের সাথে বড়াই করা এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। তারা আল্লাহ, আখেরাত, নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে গাফেল হয়ে গেছে।

তারা নিজেদের জীবন যাপনের মান উন্নয়নে ব্যস্ত। মানবতার মান কতটুকু নেমে যাচ্ছে সে চিন্তা তাদেরকে একটুও ব্যতিব্যস্ত করে না। তাদের চাই বেশী বেশী অর্থ। কোন পথে এ অর্থ অর্জিত হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তাদের নেই। তারা বিলাসদ্রব্য ও ভোগের সামগ্রী বেশী বেশী চায়। এই প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে তারা এহেন আচরণের পরিণতি থেকে সম্পূর্ণ গাফেল

হয়ে গেছে। তারা বেশী বেশী শক্তি, সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চিন্তায় মশগুল। এ প্রশ্নে তারা একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ চিন্তা করছে না যে, এগুলো আল্লাহর দুনিয়াকে যুলুমে পরিপূর্ণ করার এবং মানবতাকে ধ্বংস ও বরবাদ করার সরঞ্জাম মাত্র। মোটকথা এভাবে অসংখ্য ধরনের 'তাকাছুর' ব্যক্তি ও জাতিদেরকে তার মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যে, দুনিয়া এবং বৈষয়িক স্বার্থ ও ভোগের চাইতে বড় কোন জিনিসের কথা তারা মুহূর্তকালের জন্যও চিন্তা করে না।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - "এমনকি (এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌছে যাও।" অর্থাৎ সারাটা জীবন তোমরা এই প্রাচুর্য গড়ায় নিয়োজিত ছিলে। এখন মরার, কবরে যাওয়ার সময় এসেছে। এখনও এই চিন্তা থেকে তোমাদের রেহাই নেই।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - "কখনও না, শীঘ্রই (অচিরেই) তোমরা জানতে পারবে," তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছ। বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে অপরের চেয়ে অধিক অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছ। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। শীঘ্রই তোমরা এর অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। 'শীঘ্র' অর্থ আখেরাতও হতে পারে। কারণ আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সমগ্রকাল বাপী যে সত্তার দৃষ্টি প্রসারিত তাঁর কাছে কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ বছরও কালের সামান্য একটি অংশ মাত্র। আবার 'শীঘ্র' অর্থ মৃত্যুও হতে পারে। কারণ কোন মানুষ থেকে তার অবস্থান দূরে নয়। মানুষ সারা জীবন যেসব কাজের মধ্যে কাটিয়ে এসেছে সে মরে যাবার সাথে সাথে সেগুলো তার জন্য শুভ বা অশুভ পরিণামের বাহন ছিল কিনা তা তার কাছে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ - "আবার শুন, তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে প্রত্যক্ষভাবে জাহান্নামকে দেখতে পাবে।" হাশরের মাঠে জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। সেই হাশরের ময়দানে জাহান্নাম থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রজ্জলিত পাথরের বিরাট বিরাট খণ্ড জাহান্নামীদের হাতে, পায়ে ও গায়ে এসে পড়বে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ. - "তারপর অবশ্যই তোমাদেরকে সেইদিন এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" আল্লাহর আদালতে হিসাব নেবার সময় দুনিয়ায় তোমরা বিভিন্ন পন্থায় অর্জিত ধন-সম্পদ ও নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। কোন পথে এ সকল সম্পদ অর্জন করেছ, আর কোন পথে ব্যয় করেছ তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নেয়া হবে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, "হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে বললেন, চলো আমরা আবু হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান আনসারীর ওখানে যাই। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে ইবনুত তায়্যিহানের খেজুর বাগানে গেলেন এবং একটি গাছের ছায়ায় বসলেন। আবুল হায়ছাম এক ছড়া খেজুর এনে মেহমানদের সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, তুমি নিজে খেজুরগুলো ছিঁড়ে একটা পাত্রে করে আনলে না কেন? তিনি বললেন, আমি চাচ্ছিলাম আপনারা নিজেরা পাকা খেজুরগুলো বেছে বেছে খাবেন। কাজেই তাঁরা খেজুর খেলেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত, কিয়ামতের দিন যেসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই ঠাণ্ডা ছায়া, ঠাণ্ডা পানি ও মিষ্টি খেজুরও তার অন্তর্ভুক্ত।"

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুধু কাফেরদেরকে করা হবে না, সৎ মুমিনদেরকেও করা হবে। আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামত দান করেছেন, সেগুলো গণনা করে শেষ করা যায় না। এমন অনেক নিয়ামত আছে, মানুষ যেগুলোর কোন খবরই রাখে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا - "যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলো গণনা করতে থাকো তাহলে সেগুলো পুরাপুরি গণনা করতেও পারবে না।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৪ আয়াত)

এ নিয়ামতগুলোর মধ্যে অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ মানুষকে সরাসরি দান করেছেন, আবার বিপুল সংখ্যক নিয়ামত মানুষের উপার্জনের মাধ্যমে দান

করেন। সম্পদ মানুষ কোন উপায়ে উপার্জন ও কোন পথে খরচ করেছে সে সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে যে নিয়ামতগুলো পাওয়া গেল, সেগুলো কোন পথে খরচ করা হলো তার হিসাবও তাকে দিতে হবে। সমস্ত নিয়ামত যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এর স্বীকৃতি সে দিয়েছিল কিনা এবং নিজের ইচ্ছা, মনোভাব ও কর্মের সাহায্যে সেগুলোর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল কিনা? সে কি এ বিশ্বাস পোষণ করতো যে, এগুলো এক আল্লাহরই নিয়ামত।

বিশ্বাসের তিনটি ধারা আছে। তন্মধ্যে এ সূরায় দু'টি ধারার উল্লেখ আছে। যেমন–

১। عِلْمَ الْيَقِيْن - "জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বাস।" উদাহরণস্বরূপ মিসরের পিরামিডে ফেরাউনের মমিকৃত লাশ রাখা হয়েছে। আসলে আমি কখনো মিসর দেশে যাইনি এবং ফেরাউনের লাশও দেখিনি। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা এ কথাটি বিশ্বাস করেছি।

২। عَيْنَ الْيَقِيْن - "চাক্ষুস দেখে বিশ্বাস।" কোন কোন বিষয় এমন আছে যে, মানুষ নিজ চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করে না। একটি প্রবাদ আছে–

"যদি না দেখ নিজ নয়নে

বিশ্বাস করো না গুরুর বচনে।"

৩। حَقُّ الْيَقِيْن - "হকের উপর বিশ্বাস।" বিশ্বাসের এ ধারাটি অবশ্য এ সূরায় নেই। এ ধারাটি প্রথমেই থাকা উচিত। এ ধারাটি এমন যা চোখে দেখা যায় না আবার জ্ঞানের দ্বারাও সহজে ধরা যায় না। আল্লাহ বলেন : اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ - "যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে।" যেমন– তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

শিক্ষা : ১। পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে তোলার জন্য প্রতিযোগিতা ও বাহাদুরি করা যাবে না।

২। পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যকে অধিক উন্নতি ও সাফল্য মনে করে তুমি যে ভুল ধারণার শিকার হয়েছ, শীঘ্রই তোমাকে এসব ছেড়ে খালি হাতে কবরে যেতে হবে।

৩। আল্লাহর দেয়া অগণিত নিয়ামত কোন পথে অর্জিত ও কোন পথে ব্যয় হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে।

৪। আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক ঈমানদারের অবশ্য কর্তব্য।

৫। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর ঈমান, নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

বাস্তবায়ন : এ দারসের আলোকে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলার জন্য পার্থিব ধন-সম্পদ আল্লাহর দেয়া নিয়ামত, এ নিয়ামতের আয় ও ব্যয়ের বৈধতার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর আদালতে দেয়ার প্রস্তুতি থাকতে হবে।

সকল নিয়ামতের মালিক আল্লাহ এ স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞায় মাথা অবনত করতে হবে। সকলের প্রতি এ আহ্বান রেখে আমি আমার দারস এখানেই শেষ করলাম। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৫

আল-কুরআনের জিম্মাদারি ও পরকালের প্রস্তুতি

৫৯. সূরা আল-হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২৪, রুকূ-৩

আলোচ্য : ১৮-২১ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٨) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - (١٩) وَلَا
تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط اُولٰئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ - (٢٠) لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ - (٢١) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى
جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১৮) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য রাখে, সে আগামী দিনের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছে? তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সেসব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করো। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই ফাসেক। (২০) দোযখবাসীরা আর জান্নাতবাসীরা পরস্পর সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতে যাবে তারাই সফলকাম। (২১) আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে, তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং

ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আমি মানুষের সামনে এসব উদাহরণ এজন্য পেশ করি যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা।"

শব্দার্থ : اٰمَنُوْا - যারা ঈমান এনেছো। اتَّقُوا اللّٰهَ - তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। وَلْتَنْظُرْ - সে যেন লক্ষ্য রাখে। نَفْسٌ - প্রত্যেকে। مَا قَدَّمَتْ - কি প্রস্তুতি নিয়েছে, অগ্রিম পাঠিয়েছে। لِغَدٍ - আগামী দিনের জন্য। وَاتَّقُوْا - তোমরা ভয় কর। خَبِيْرٌ - খবর রাখেন। بِمَا - যা কিছু। تَعْمَلُوْنَ - তোমরা কর। لَا تَكُوْنُوْا - তোমরা তাদের মত হয়ো না। نَسُوا اللّٰهَ - যারা আল্লাহকে ভুলেছে। فَاَنْسٰهُمْ - তিনি তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন। اَنْفُسَ - নিজেদেরকে। فٰسِقُوْنَ - ফাসেকগণ। لَا يَسْتَوِىْ- সমান হতে পারে না। اَصْحٰبُ - সম্প্রদায়। اَلنَّارَ - দোযখ। اَلْجَنَّةَ - বেহেশত। اَلْفَائِزُوْنَ - কৃতকার্য, সফলকাম। لَوْ - যদি। اَنْزَلْنَا - আমি অবতীর্ণ করতাম। هٰذَا - এই। جَبَلٍ - পাহাড় বা পর্বত। لَرَاَيْتَهٗ - অবশ্যই তুমি তাকে দেখতে। خَاشِعًا - ভীত-সন্ত্রস্ত, বিনীত। مُتَصَدِّعًا - ফেটে চৌচির, বিদীর্ণ। تِلْكَ - এই। اَمْثَالُ - উদাহরণসমূহ। يَتَفَكَّرُوْنَ - তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

নামকরণ : এই সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ - অংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে হাশর। হাশর অর্থ একত্র করে ঘেরাও করা।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : "সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, তেমনি সূরা হাশর বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।" হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য এরূপ : قُلْ سُوْرَةَ النَّضِيْرِ - "সূরা নাযীর বলো"। সকল তাফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের সাথে একমত। এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিষ্কারের উল্লেখ আছে তারা বনী নাযীর গোত্রেরই লোক। ইয়াযীদ ইবনে রূমান,

মুজাহিদ এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, উহুদ যুদ্ধের পরে বিরে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনা, তারপর বনী নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

শানে নুযূল : মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না এবং তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বনী নাযীর এই চুক্তি ভঙ্গ করে, যার কারণে তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী (সা)-কে তাদের উপর বিজয় দান করেন এবং তিনি তাদেরকে এখান থেকে বের করে দেন। তারা যে এখান থেকে উচ্ছেদ হবে এটা মুসলমানদের কল্পনাও ছিল না। স্বয়ং ইহুদীরাও ধারণা করেনি যে, তাদের এ সুদৃঢ় দুর্গ ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী থাকা অবস্থায় তাদের কোন ক্ষতি সাধিত হতে পারে। কিন্তু যখন হঠাৎ তাদের উপর এমনভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লো যে, তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বের করে দিলেন। তাদের কেউ গেল সিরিয়ার কৃষি ভূমির দিকে আবার কেউ গেল খায়বারের দিকে। রাসূলুল্লাহর অনুমতিক্রমে তারা তাদের ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র যা কিছু উটের উপর বোঝাই করে (অস্ত্র ব্যতীত) নিয়ে যেতে পারে তা ইচ্ছামত নিয়ে গেল, বাকী যা থাকলো তা মুসলমানদের হাতে আসলো।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ কাফিররা ইবনে উবাই ও তার মুশরিক সঙ্গীদেরকে পত্র লিখলো। পত্রটি রাসূলুল্লাহ (সা) বদর প্রান্তর থেকে ফেরার আগেই তাদের হস্তগত হয়। পত্রে লিখা ছিল : "তোমরা আমাদের সাথীকে (রাসূলুল্লাহ সা.-কে) তোমাদের ওখানে স্থান দিয়েছ। এখন হয় তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে ওখান থেকে বের করে দাও, না হয় আমরাই তোমাদেরকে বের করে দেবো এবং আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করবো। অতঃপর তোমাদের সকল বীর পুরুষ ও যোদ্ধাকে হত্যা করবো এবং নারী ও কন্যাদেরকে দাসী বানাবো। আল্লাহর

শপথ! এ কাজ আমরা অবশ্যই করবো। সুতরাং তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো।"
আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার মূর্তিপূজক সঙ্গীরা এ পত্র পেয়ে পরস্পর পরামর্শ করে গোপনীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিকট গিয়ে বলেন : "আমি অবগত হয়েছি যে, কুরাইয়শদের পত্র তোমাদের হস্তগত হয়েছে এবং পত্রের মর্মানুযায়ী তোমরা তোমাদের মৃত্যুর আসবাব পত্র নিজেদের হাতে তৈরী করতে শুরু করেছো। আমি আর একবার তোমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে এ অসৎ সংকল্প থেকে বিরত থাক।"
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপদেশে তারা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেলো।" কিন্তু কুরাইশরা বদর যুদ্ধ থেকে ফারেগ হয়ে আবার পত্র লিখে পূর্বের মতই হুমকি দিলো এবং নিজেদের শক্তি, সংখ্যা ও দুর্ভেদ্য দুর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এর ফলে মদীনার বনু নাযীর গোত্র চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলো। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলো যে, তিনি যেন ত্রিশজন লোকসহ তাদের দিকে অগ্রসর হন এবং তারাও তাদের ত্রিশজন পণ্ডিত লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উভয় দল মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। যদি তাদের এ লোকগুলো তাঁকে সত্যবাদীরূপে মেনে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে তবে তারাও তাঁর সাথে থাকবে।
তাদের এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় সৈন্যবাহিনীসহ তাদেরকে অবরোধ করেন এবং বলেন, "তোমরা যদি আবার নতুনভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর কর তবে তো ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই।" তারা তাঁর এ প্রস্তাব প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করলো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। সুতরাং সারাদিন ধরে যুদ্ধ চললো। পরদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ (সা) বানু নাযীরকে উক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে বানু কুরাইযার নিকট সেনাবাহিনীসহ গমন করেন। তাদেরকেও তিনি নতুনভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তারা তা মেনে নেয় এবং তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় বানু নাযীরের নিকট আসলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তারা পরাজিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার

নির্দেশ দেন এবং বলেন, "তোমরা উট বোঝাই করে যত আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পার নিয়ে যাও। শুধু অস্ত্র নেয়া যাবে না।" এই যুদ্ধে গনিমতের মাল হিসাবে যত সম্পদ পাওয়া গিয়েছে, আর কোন যুদ্ধে এতো গনিমতের মাল পাওয়া যায়নি।

আসহাবে মাগাযী ওয়াস-সিয়ার এ যুদ্ধের কারণ যা বর্ণনা করেছেন তা এই যে, মুশরিকরা প্রতারণা করে বিরে মাউনা নামক স্থানে সত্তরজনের মধ্যে উনসত্তর জন সাহাবীকে শহীদ করে দেয়। তাঁদের মধ্যে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া দামারী (রা) নামক সাহাবী কোন রকমে রক্ষা পেয়ে পলায়ন করেন এবং মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে সুযোগ পেয়ে তিনি বানু আমের গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করেন, অথচ এ গোত্রটি রাসূল (সা)-এর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন। কিন্তু হযরত আমের (রা)-এর এ খবর জানা ছিল না। মদীনায় পৌঁছে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন : "তুমি কি তাদেরকে হত্যা করেছ? তাহলে তো এখন তাদের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে?" বানু নাযীর ও বানু আমেরের মধ্যেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সন্ধি ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বানু নাযীরের নিকট গমন করলেন এ উদ্দেশ্যে যে, রক্তপণের তারা কিছু অংশ আদায় করবে এবং আমি কিছু আদায় করবো। আর এভাবে বানু আমেরকে সন্তুষ্ট করবেন। বানু নাযীর গোত্রের বসতি মদীনার পূর্বদিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে পৌঁছলে তারা তাঁকে বললো : "হে আবুল কাসিম! হাঁ, আমরা এজন্য প্রস্তুত আছি। এখনই আমরা আমাদের অংশ মুতাবিক সম্পদসহ আপনার খেদমতে হাজির হচ্ছি।" অতঃপর তারা তাঁর নিকট থেকে সরে গিয়ে পরস্পর পরামর্শ করলো : "এর চেয়ে বড় সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে? এখন তিনি আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছেন, এসো আমরা তাঁকে শেষ করে ফেলি।" তারা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, যে দেয়াল ঘেঁষে তিনি বসে আছেন, ঐ ঘরের উপর কেউ উঠে যাবে এবং সেখান থেকে সে তাঁর উপর একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করবে। এতেই তাঁর জীবন লীলা শেষ হয়ে যাবে।

আমর ইবনে জাহ্হাশ ইবনে কা'ব এ কাজে নিযুক্ত হলো। অতঃপর সে কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে ছাদে আরোহণ করলো। ইতিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে পাঠিয়ে নবী (সা)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন সেখান থেকে চলে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। ফলে ঐ নরাধম তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলো। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। যেমন– হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা) প্রমুখ। তিনি সেখান থেকে সরাসরি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। আর ওদিকে যেসব সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন না এবং মদীনাতেই তাঁর জন্য অপেক্ষমান ছিলেন, তাঁরা তাঁর বিলম্ব দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু একটি লোকের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন যে, তিনি মদীনায় পৌঁছে গেছেন। সুতরাং তাঁরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাঁদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়েন। ইহুদীরা মুসলিম বাহিনীকে দেখে দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে ছয় দিন অবরোধ করে রাখেন এবং এরই মধ্যে কিছু কিছু খেজুর বাগানের গাছ কেটে ফেলার ও জ্বালিয়ে দিবার নির্দেশ দেন। একদিকে তাদের খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলার দুঃখ অপরদিকে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পক্ষ থেকে যে সাহায্য আসার কথা ছিল সেদিক থেকেও নৈরাশ্য তাদের কোমর একেবারে ভেঙ্গে দিল। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করলো, তিনি যেন তাদের প্রাণ রক্ষা করেন। তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। অনুমতিক্রমে তারা উটের উপর বোঝাই করে ইচ্ছামত ধন-সম্পদ নিয়ে গেল। এগুলো নিয়ে তারা সিরিয়া ও খায়বারে বসতি স্থাপন করে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : বনী নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। বনী নাযীর একটি বৃহৎ গোত্র যার জনসংখ্যা সে সময় মুসলমানদের জনসংখ্যার তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। অর্থ-সম্পদে অগ্রসর, যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের কোন অভাব ছিল না, যাদের দুর্গসমূহও ছিল

অত্যন্ত মজবুত। মাত্র কয়েক দিনের অবরোধের মুখে তারা টিকে থাকতে পারলো না এবং একজন মানুষ নিহত হওয়ার মত পরিস্থিতিরও উদ্ভব হলো না। তারা শত শত বছর ধরে গড়ে উঠা তাদের এ মজবুত জনপদ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে রাজী হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, এটা মুসলমানদের শক্তির দাপটে হয়নি এবং তারা যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ ফল। আর যারা আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায় তারা এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়।

যুদ্ধ ও সন্ধির ফলে যেসব সম্পদ মুসলমানদের বা ইসলামী সরকারের হস্তগত হয় তার বন্দোবস্ত কিভাবে করতে হবে সেই বিধিবিধান এখানে বলে দেয়া হয়েছে।

ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হলেও যাদের মধ্যে ঈমানের প্রাণসত্তা নেই, তাদেরকে উপলক্ষ করেই এখানে উপদেশ দেয়া হয়েছে। ঈমানের মূল দাবী কি? তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যে মূল পার্থক্য কি? যে কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে তার গুরুত্ব কতটুকু এবং যে আল্লাহ ও রাসূলের (সা) উপর তারা ঈমান এনেছে, সেই আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে আবার কি করে যুদ্ধ করতে পারে ইত্যাদি এই সূরার বিষয়বস্তু।

ব্যাখ্যা : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - "হে ঈমানদারেরা!" কুরআন মজীদের নিয়ম হলো, যখনই মুনাফিক মুসলমানদের মুনাফিক সুলভ আচরণের সমালোচনা করা হয় তখনই তাদেরকে নসীহতও করা হয়। যাতে তাদের যার যার মধ্যে এখনো কিছুটা বিবেক অবশিষ্ট আছে সে যেন তার এই আচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়।

اتَّقُوا اللّٰهَ - আল্লাহকে ভয় করে ধ্বংসের সেই গহ্বর থেকে উঠে আসার চিন্তা করে। وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ - "প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য রাখে, সে আগামী দিনের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।" আগামী কাল অর্থ আখেরাত। দুনিয়ার এই গোটা জীবনকাল হলো 'আজ' এবং কিয়ামতের দিন হলো আগামী কাল যার আগমন ঘটবে আজকের এই দিনটির পরে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত বিজ্ঞচিতভাবে মানুষকে

বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য আর মাথা গুজবার ঠাঁই থাকবে কিনা সেকথা চিন্তা করে না সেই ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড় নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন গঠনে এতই ব্যস্ত যে, আখেরাতের কথা একটুও চিন্তা করে না। আজকের দিনটির পরে যেমন কালকের দিনটি আসবে তেমনি আখেরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রিম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই পাবে না।

এর সাথে দ্বিতীয় জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এ আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের হিসাব পরীক্ষক বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে তার ভাল ও মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ সে উপলব্ধি করতে পারে না যে, সে তার আখেরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে, না ধ্বংস করছে। তার অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠে তখন সে নিজেই হিসাব-নিকাশ করে দেখবে, সে তার সময়, শ্রম, সম্পদ, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে খরচ করছে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার নিজের স্বার্থেই বিষয়টি চিন্তা ও বিবেচনা করা দরকার। অন্যথায় সে নিজের ভবিষ্যত নিজেই ধ্বংস করবে।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, অবশ্যই তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তায়ালা তার পুরাপুরি খবর রাখেন।"

কুরআন মজীদের সূরা আত-তাগাবুনে বলা হয়েছে–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ "তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।" (৬৪ : ১৬)

اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِه ـ "তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে ভয় কর, যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত।" (আলে ইমরান : ১০২ আয়াত)

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا - আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (আল-বাকারা : ২৮৬ আয়াত)

আর এখানে বলা হয়েছে : "তোমাদের সাধ্যে যতটা কুলায় আল্লাহকে ভয় করতে থাক।" উপরের তিনটি বাক্য একত্রে বিবেচনা করলে মনে হয় যে, আল্লাহর দ্বীনে মানুষ শুধু ততটুকুর জন্যই দায়ী যতটুকু করার সাধ্য তার আছে। কাজেই প্রত্যেক ঈমানদার যেন তার সাধ্যানুযায়ী তাকওয়া গ্রহণের চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি না করে। যে কাজ বা যতটুকু সাধ্যের বহির্ভূত, সেজন্য তাকে দায়ী করা হবে না।

তোমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে যা কিছু করছ আল্লাহ অন্তর্যামী, তিনি সব কিছুই জানেন ও দেখেন। عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - গোপন ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন।

وَلاَتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

"তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।"

আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো নিজেকে ভুলে যাওয়া। সে কার বান্দা সে কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন অনিবার্যরূপে দুনিয়ায় সে তার একটা ভুল অবস্থান ঠিক করে নেয়। এই মৌলিক ভ্রান্তির কারণে তার গোটা জীবনই ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। সে যে এক আল্লাহর বান্দা এ কথা যখন সে ভুলে যায় তখন সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে যাদের বান্দা নয় তাদের বন্দেগী করতে থাকে। এটা আর একটা মারাত্মক ভুল যা তার গোটা জীবনকেই ভুলে পরিণত করে। পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা বা অবস্থান হলো সে বান্দা বা গোলাম, স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সে যে এক আল্লাহর বান্দা এ কথাটি সে জানে না, প্রকৃতপক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও যদি সে তা ভুলে যায়, সেই মুহূর্তে সে এমন কোন কাজ করে বসতে পারে যা কোন খোদাদ্রোহী মানুষই করতে পারে। আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ -

"তারপর আমি তাকে নীচুদের চেয়েও নীচে নামিয়ে দিয়েছি।" (আত্-তীন : আয়াত ৫)

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায় দুনিয়ার জীবনে ভোগবিলাস ও আনন্দে মগ্ন হয়ে সে আরও অধিক ভোগবিলাসের জন্য আত্মহারা হয়ে যুলুম-নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। মানবতা, বিচার-বিবেচনা মন থেকে বিদায় নেয়। অন্যের উপর অত্যাচার-অবিচার চালাতে তাঁকে। চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার কথা ভাবতেও শিখেনি। হায়ওয়ান জানোয়ারের চেয়েও সে অধম হয়ে যায়। মানুষ হয়ে সে যেসব জঘন্য কাজ করে, কোন চতুষ্পদ জন্তুও এমন কাজ করতে পারে না।

সঠিক পথের উপর টিকে থাকা পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহর স্মরণ ও রহমতের উপর। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে গাফেল হওয়া মাত্রই সে নিজের সম্পর্কেও গাফেল হয়ে যায় এবং এই গাফলতিই তাকে ফাসেক বানিয়ে দেয়।

لَايَسْتَوِىْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ - (٢٠)

"জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসী লোকেরা কখনও সমান হতে পারে না। জান্নাতবাসীরা অবশ্যই সফলকাম।"

অর্থাৎ তাদের স্বভাব-চরিত্র, চালচলন, মত, পথ ও পরিণতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গেছে, কোথাও তা একত্রে মিলিত হয় না। আকার আকৃতিতেও নয়, নীতি প্রকৃতিতেও নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও তা এক কাতারে মিলিত হয় না। মূলত জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। এখানে জাহান্নামীদের কোন উল্লেখ নেই। কারণ ওটা তো একটা ভ্রান্ত ও ব্যর্থ পথ, ওটা নিয়ে আবার আলোচনার প্রয়োজন নেই।

لَوْاَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ - (٢١)

"আমরা যদি ঐ কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে কিভাবে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ধ্বসে পড়ে! এই উদাহরণগুলো আমরা লোকদের সম্মুখে এই কারণে পেশ করছি যে, তারা যেন (নিজেদের অবস্থা ও কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করে।"

এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব মহানত্ব এবং তাঁর নিকট বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বাধ্যবাধকতার কথা কুরআন মজীদে যেভাবে স্পষ্ট করে বলে, পর্বতের ন্যায় বিরাট সৃষ্টিও যদি তার সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে পারতো এবং এক মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্মুখে নিজের আমলের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তা যদি সে জানতে পারতো তাহলে ভয়েও আতংকে সে কেঁপে উঠতো। কিন্তু মানুষের নিশ্চিন্ততা ও চেতনাহীনতা অধিক আশ্চর্যজনক। তারা কুরআন বুঝে এবং তার সাহায্যে সব কিছুর মূলতত্ত্ব যথাযথ জানতে পারে, তারপরও তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় না। যে বিরাট দায়িত্ব মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যে বিষয়ে তারা আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করবে সে বিষয়ে একবিন্দু চিন্তাও তাদেরকে প্রকম্পিত করে না। কুরআন পড়া, শুনা ও বুঝার পরও তার কোন প্রভাব তাদের মনের মধ্যে কাজ করে না। মনে হয় তারা মানুষ নয়, নিষ্প্রাণ, নির্জীব ও চেতনাহীন পাথর। অথচ আল-কুরআন মানুষের উপরই নাযিল হয়েছে, আর মানুষের এ অবস্থা সত্যই হতাশাব্যঞ্জক।

শিক্ষা : ১। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াই আখেরাতের একমাত্র কর্মক্ষেত্র। এখান থেকে অনন্ত আখেরাতের জন্য পুঁজি সংগ্রহ না করলে সেখানে গিয়ে কিছুই পাওয়া যাবে না।

২। মানুষ যে আল্লাহর বান্দা, এ কথা ভুলে গেলে তার বন্দেগী অন্যদিকে চলে যাবে, গোটা জীবনকেই সে ভুলে পরিণত করে ফেলবে।

৩। দোযখবাসীরা অপরাধী, শাস্তিপ্রাপ্ত, আর বেহেশতবাসীরা সুখী, পুরস্কার প্রাপ্ত। উভয় দল কখনও এক সমান নয়। আসলে বেহেশতবাসীরাই কৃতকার্য।

৪। আল্লাহ কুরআনকে নাযিল করেছেন মানুষের উপর। মানুষকে চেতনাশীল ও হুঁশিয়ার করার জন্যই পাহাড়ের উপর নাযিলের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

বাস্তবায়ন : এ দারসের আলোকে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলার জন্য আখেরাতের পুঁজি সংগ্রহের একমাত্র কর্মক্ষেত্র এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া। কাজেই এ দুনিয়া থেকে অধিক পুঁজি সংগ্রহ করে নেয়ার আহ্বান রেখে আমি আমার দারস শেষ করছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৬

মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ

৪. সূরা আন্-নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-১৭৬, রুকূ-২৪

আলোচ্য : ৭৫-৭৬ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٧٥) وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ (٧٦) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْآ اَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ (٧٦)

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৭৫) "তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না সেইসব দুর্বল-অসহায়, পুরুষ-নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে প্রভু! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী ঠিক করে দাও।

(৭৬) আর ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।"

শব্দার্থ : لَكُمْ - তোমাদের জন্য। تُقَاتِلُوْنَ - তোমরা যুদ্ধ করবে। سَبِيْلِ - পথ, রাস্তা। اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ - দুর্বলেরা, اَلرِّجَالِ - পুরুষেরা, اَلنِّسَاءِ - মহিলারা, اَلْوِلْدَانِ - শিশুরা, يَقُوْلُوْنَ - তারা বলে। اَخْرِجْنَا - আমাদের বের কর। اَلْقَرْيَةِ - জনপদ (এলাকা), ظَالِمِ - অত্যাচারী, اَهْلُهَا - তার অধিবাসী, اجْعَلْ لَنَا - আমাদের জন্য বানিয়ে দাও, لَدُنْكَ - তোমার পক্ষ থেকে, نَصِيْرًا - সাহায্যকারী, كَفَرُوْا - অবিশ্বাসীরা, اَلطَّاغُوْتِ - বিদ্রোহী, প্রত্যাখ্যানকারী (শয়তান), فَقَاتِلُوْا অতএব তোমরা যুদ্ধ করো, اَوْلِيَاءَ - অভিভাবক, كَيْدَ - চক্রান্ত, ضَعِيْفًا - দুর্বল।

নামকরণ : এই সূরার প্রথম আয়াত وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً -এর نِسَاءً - শব্দকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। نِسَاءً এর অর্থ স্ত্রীলোক।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। ওহুদ যুদ্ধের পর তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময় কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ভাষণে এ সূরাটি নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয় : মদীনায় ইসলামী সমাজ কায়েম হওয়ার তিন বৎসর পর সূরাটি নাযিল হয়। তাই ইসলামী সমাজের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান এই সূরায় বেশী আলোচিত হয়েছে। (১) পরিবার গঠন, (২) বিয়ে-শাদী, (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্কের সীমা, (৪) এতিমের অধিকার, (৫) মীরাছ (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বণ্টন, (৬) অর্থনৈতিক লেনদেন পদ্ধতি, (৭) ঘরোয়া বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি, (৮) অপরাধের শাস্তি বিধান, (৯) মদপান নিষেধ, (১০) পাক-পবিত্র হওয়ার বিধান, (১১) মানবতার মুক্তি ও জিহাদের গুরুত্ব, (১২) ইসলামী সংগঠন পদ্ধতি, (১৩) আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের কাজের সমালোচনা ও তাদের ব্যাপরে সতর্কতা অবলম্বন, (১৪) তায়াম্মুমের অনুমতি, (১৫) ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার, (১৬) ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়া ইত্যাদি।

আলোচ্য অংশের মূল্য বক্তব্য : সমাজের নির্যাতিত, অসহায়, দুর্বল নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে যুলুমের হাত থেকে রক্ষার জন্য জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুমিন বান্দারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কাফিররা তাগুতী শক্তি শয়তানের পথে যুদ্ধ করে বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।

শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করার পরেও মক্কায় এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা শারীরিক দুর্বলতা এবং আর্থিক অভাবের কারণে হিজরত করতে পারেননি। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস ও তার মা সালামা বিনতে হিশাম, অলীদ ইবনে অলীদ, আবু জানদাল ইবনে সাহল প্রমুখ। কাফেররা তাদের হিজরতে বাধা দেয় এবং তাদের উপর নানাভাবে যুলুম নির্যাতন করতে থাকে, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন থেকে নিস্তার লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সেই ফরিয়াদ কবুল করে মুসলমানদের জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে নির্যাতিত এ অসহায় লোকদেরকে উদ্ধারের জন্য অত্র আয়াত নাযিল করেন।

ব্যাখ্যা : প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, মক্কায় থেকে যাওয়া অসহায় নারী, পুরুষকে ও শিশুদের মক্কার কাফেররা ইসলামের পথ পরিহার করার জন্য কঠিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতো। কিন্তু এসব মুমিন নারী, পুরুষেরা শারীরিক দুর্বলতা ও আর্থিক অনটনের জন্যু রাসূলে করীম (সা)-এর সাথে হিজরত করতে না পারলেও তারা ইসলাম ত্যাগ করতে কিছুতেই রাযী ছিল না। তারা ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্যই আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করে বলেছিল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এ যালেমদের মক্কা শহর থেকে বের করে নিরাপদ স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা কর অথবা তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রক্ষার জন্য সাহায্যকারী বন্ধু ও অভিভাবক প্রেরণ কর।

এই মযলুম ঈমানদারদের দুটো ফরিয়াদই আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন। যেমন– মক্কা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রথম আবেদন এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় আবেদন পূরণ করেন।

আল্লাহ তায়ালা মদীনার সংগঠিত মুসলিম শক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তোমরা মক্কার নির্যাতিত, অসহায় মুসলমানদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য জিহাদ করছো না কেন? যেখানে কঠোর নির্যাতন, অত্যাচারের দ্বারা মানবতা লঙ্ঘন করা হচ্ছে! অথচ মানবতা রক্ষা করা এবং মযলুমকে সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সেই সময়কার মক্কার কাফের, মুশরিকদের দ্বারা যেভাবে অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের ঈমান থেকে বেঈমান করার জন্য অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিল, একইভাবে বর্তমান যুগেও সারা দুনিয়ার অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুরাও ইহুদী, খৃস্টান, মুশরিক ও মুসলমান নামধারী ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। তারা মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। যেমন বসনিয়া, আলবেনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, তুরস্ক ও ইরাকের মুসলমানদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও জেল-যুলুম, যবাই ও হত্যার দ্বারা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

তৎকালীন মক্কার অসহায় মুসলমানগণ যেমন তাদের ঈমান-আকীদা ও নিজেদের বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল, আজও ঠিক তেমনিভাবে সারা দুনিয়ার নির্যাতিত অসহায় মুসলমানগণ তেমনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মক্কার অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ষার জন্য যেমনিভাবে আয়াত নাযিল করে মদীনার মুসলমানদের জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, আজকেও আল কুরআনের সেই আয়াত ঈমানদার মুসলমানদেরকে একই নির্দেশ দিচ্ছে।

কারণ কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ কেবল কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালীন লোকদের জন্যই নয়। বরং তার আদেশ-নিষেধ চিরকালীন, সব সময়ের জন্য এবং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আল-কুরআন হলো সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ পরিপূর্ণ জীবন বিধান। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতেও নিজের দেশসহ সারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতিত মযলুম মুসলমানদেরকে উদ্ধারের জন্য প্রত্যেকের উপর জিহাদ করা ফরযসমূহের মধ্যে বড় ফরয।

আমাদের সৌভাগ্য যে, বর্তমান যুগে আমাদের দেশে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে হয় না। ন্যায়নীতিতে জনগণের ভোটের মাধ্যমেই জিহাদের কাজ করা যায়। ঈমানদারগণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এখানে বলেন :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ـ

"ঈমানাদারেরা জিহাদ করে আল্লাহর পথে আর কাফের লড়াই করে তাগুতী শক্তির পক্ষে।"

এটা আল্লাহর দৃঢ় সিদ্ধান্ত। সমাজে ইসলামী শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে জিহাদই হচ্ছে ঈমানদার লোকদের মূল্য কাজ। এ বিষয়ে সূরা হজ্জে বলা হয়েছে– وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ .

"তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।"

(সূরা হজ্জ : ৭৮ আয়াত)

কাজেই মযবুত ঈমানদারেরা কখনো জিহাদের কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

শিক্ষা : (ক) অত্যাচারী যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঈমানদার মযলুমদেরকে ও মানবতাকে রক্ষা করা আল্লাহর নির্দেশ।

(খ) আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী দল ছাড়া অন্য কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার দলে জড়িত থাকা যাবে না।

(গ) যালেমদের সাজ-সরঞ্জাম ও শক্তি দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। নিশ্চয়ই যালেমদের চক্রান্ত অতি দুর্বল।

(ঘ) প্রথমে নিজের দেশ, পরবর্তীতে সারা দুনিয়ায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য দলবদ্ধভাবে আন্দোলন ও জিহাদ করতে হবে।

(ঙ) আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে মযবুত ঈমান ও বিশুদ্ধ নিয়াত (অভিপ্রায়) থাকতে হবে।

বাস্তবায়ন : আর সারা দুনিয়ায় মানবতা রক্ষা, অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধার ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দলবদ্ধভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে দারস শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন। ওয়া আখিরুদাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

দারস : ৭

জান্নাত প্রাপ্তির সহজ পথ

৯. সূরা আত্-তওবা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-১২৯, রুকূ-১৬

আলোচ্য : ১১১ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١١١) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১১১) “নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর যিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আল্লাহ্‌র চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে ব্যবসা করেছো সেজন্য খুশি হও। এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।”

শব্দার্থ : اِشْتَرٰى - ক্রয় করে নিয়েছেন, اَنْفُسَهُمْ - তাদের জান, জীবন, اَمْوَالَهُمْ - তাদের সম্পদরাজি, بِاَنَّ -বিনিময়ে, اَلْجَنَّةُ বেহেশত, يُقَاتِلُوْنَ - তারা লড়াই করে। سَبِيْلِ - পথে, فَيَقْتُلُوْنَ - তারা অতঃপর হত্যা করে, وَيُقْتَلُوْنَ - তারা নিহত হয়, وَعْدًا - ওয়াদা রয়েছে,

عَلَيْهِ - এ সম্পর্কে, حَقًّا - সত্য, اَوْفٰى - পূরণকারী, بِعَهْدِهٖ - তাঁর ওয়াদার, فَاسْتَبْشِرُوْا - অতএব তোমরা খুশী হও, بِبَيْعِكُمْ - তোমাদের কেনা-বেচায়, ব্যবসা, اَلَّذِىْ - যা, بَايَعْتُمْ - তোমরা কেনা-বেচা বা ব্যবসা করেছ, اَلْفَوْزُ - সফলতা, اَلْعَظِيْمُ - বিরাট, মহান।

নামকরণ : এ সূরা দু'টি নামে পরিচিত। প্রথম নাম তওবা আর দ্বিতীয় নাম বারায়াত। এ সূরার এক স্থানে কোন কোন ঈমানদার লোকদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বারায়াত অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। মুনাফিক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা এ সূরার শুরুতেই করা হয়েছে।

সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ : এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম না লেখার বিভিন্ন কারণ তফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু ইমাম রাযী যে কারণটি উল্লেখ করেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তাহলো নবী করীম (সা) নিজেই এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখাননি। এ কারণে সাহাবায়ে কিরামও লেখেননি। পরবর্তী কালের লোকেরাও একই নীতি অনুসরণ করেছেন। কুরআন মজীদকে নবী করীম (সা) থেকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটা তার এক অতিরিক্ত প্রমাণ।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ও সূরার বিভিন্ন অংশ : সূরাটি তিনটি ভাষণে শেষ হয়েছে। প্রথম ভাষণটি সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকূর শেষ পর্যন্ত। এর অবতীর্ণের সময় হচ্ছে নবম হিজরীর যিলকাদ মাসের নিকটবর্তী কোন সময়। নবী করীম (সা) এ বছর হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ (হজ্জের অনুষ্ঠান পরিচালক) নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ই এ ভাষণটি অবতীর্ণ হয়। আর তখনই নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পিছনে পিছনে মক্কায় পাঠালেন যেন হজ্জের সময় আরবের সকল হজ্জযাত্রী প্রতিনিধিদের সম্মেলনে তা পাঠ করে শুনানো হয় এবং এ ভাষণের আলোচ্য বিষয়ের মর্মানুসারে যে কর্মনীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা যেন সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ষষ্ঠ রুকূর শুরু থেকে ৯ম রুকূর শেষ পর্যন্ত। এটি নবম হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছু পূর্বে নাযিল হয়। তখন নবী করীম (সা) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এতে ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদে যোগদান উৎসাহিত করা হয়। আর যারা মুনাফিকী, ঈমানের দুর্বলতা ও গাফলতির কারণে আল্লাহর পথে জান মাল খরচ করতে প্রস্তুত ছিল না তাদেরকে তিরস্কৃত করা হয়।

তৃতীয় ভাষণটি দশম রুকূ থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলে। এ অংশ তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নাযিল হয়। এতে এমন কতগুলো অংশও রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। পরে নবী করীম (সা) আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এসব কয়টিকে একত্র করে একই ভাষণের ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত করেন। এ অংশ কয়টি একই বিষয় সম্পর্কিত।

এতে মুনাফিকদের তাম্বিহ (সতর্ক) করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক সত্যিকারভাবে ঈমানদার থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল, তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ সূরার বিভিন্ন অংশ নাযিলের ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সর্বশেষে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে তার স্থান সর্বপ্রথম এবং অপর ভাষণ দুইটিকে শেষে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি : এ সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে। ঘটনা পরম্পরার সাথে এ সূরার বিষয়বস্তুর যে সম্পর্ক তার সূচনা হয় হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ছয় বছরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনা সংগ্রামের ফল এই হয়েছিল যে, আরবের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংবাদ, সমাজের বিধান ও ব্যবস্থা, এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়, তখন দ্বীন ইসলাম অপেক্ষাকৃত অধিক শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশে চারিদিকে সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অতঃপর ঘটনার গতি

দু'টি বড় পথে চলতে শুরু করে, যার পরিণামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটির সম্পর্ক আরবদেশের সাথে, আর অপরটির সম্পর্ক রোমান সাম্রাজ্যের সাথে। আরবদেশের সাথের পরিণামে মক্কা বিজয়, আর রোমান সাম্রাজ্যের সাথের পরিণামে বিনা যুদ্ধে রুম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন এলাকা মুসলিমদের প্রভাবাধীন হয়।

ব্যাখ্যা : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

"আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।"

আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে ঈমানের ব্যাপারটিকে এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেনরূপে অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে : ঈমান প্রকৃতপক্ষে একটি অংগীকার ও চুক্তি যা দিয়ে বান্দা নিজের স্বকীয় সত্তা ও নিজের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় এবং এর বিনিময়ে বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা-বেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা গভীরভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

প্রকৃত কথা হলো, মানুষের ধন-প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ তিনিই তাঁর এবং তাঁর কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। মানুষ যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করছে তাও তিনিই তাকে দিয়েছেন। কাজেই এ যুক্তিতে তো কেনা-বেচার কোন প্রশ্নই উঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই যা সে বিক্রি করবে। আবার আল্লাহর মালিকানার বাইরেও এমন কোন জিনিষ নেই যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার এখতিয়ার বা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেই নিজের সত্তার ও নিজের প্রতিটি জিনিসের উপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে

স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা-বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন, যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন, সে ব্যাপারে তিনি মানুষের কাছে দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নয়) আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এই সঙ্গে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয়, বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এই কেনা-বেচার চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। ঈমান আসলে এই কেনা-বেচার অপর নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যাতে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায় সে কাফের। আসলে এই চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে চলার নামই কুফরী।

কেনা-বেচার এই তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তরনিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাক।

এক. আল্লাহর সাথে এ চুক্তির ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দু'টি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক হিসেবে গণ্য করে কিনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ে নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এ দুনিয়ার জীবনে আমরা যে ইবাদত-ই বন্দেগী করি তার নগদ মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না, বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তাঁর পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে

নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করে দিতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাযী হয়ে যাবার মত আস্থা তাঁর প্রতি আছে কিনা?

দুই. আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দা তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী আল্লাহর নিকট সোপর্দ করবে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি কলেমা শাহাদাতের স্বীকৃতি দেয় এবং নামায-রোযা ইত্যাদির বিধান মেনে চলে কিন্তু নিজের দেহ-মন-প্রাণ, শারীরিক শক্তি, ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণ এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মালিক নিজেকে মনে করে এবং সেগুলোকে ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মুমিন মনে করা হবে কিন্তু আল্লাহর নিকট সে কখনও মুমিন হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনা-বেচার ব্যাপারকে ঈমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে কোন বেচা-কেনার কাজই করেনি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধন-প্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধন-প্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা– এ দু'টি কার্যধারাই চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দেয় যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধন-প্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রিত জিনিসকে যথারীতি নিজের জিনিস মনে করছে।

তিন. ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, যে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে, তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা বেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার।

অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বয়ে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর শরয়ী আইনের বিধি-নিষেধমুক্ত হয়ে কোন নীতি পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি এবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আচরণ অবলম্বন করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে জানতে পারবে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ গ্রহণ করবে। আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত হয়ে কাজ করা এবং পরামর্শ না করে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একটি কুফরী আচরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

চার. নিজ মর্জিমত কোন জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহর ইচ্ছার নয়, বরং নিজেরই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ বেচা-কেনার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর হেদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে কৃত নিজের কেনা-বেচার চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

"বিক্রেতা নিজের পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের উপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে।" এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাতপ্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকাল শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা-বেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে, একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর পূর্বে ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

উপর থেকে যে ধারাবাহিক ভাষণ চলে আসছিল তাতে এমন সব লোকের কথা ছিল যারা ঈমান আনার অংগীকার করেছিল ঠিকই, পরীক্ষার কঠিন সময় উপস্থিত হলে তাদের অনেকে গাফলতির কারণে, অনেকে

আন্তরিকতার অভাবে এবং অনেকে চূড়ান্ত মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করার ফলে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য নিজের সময়, ধন-সম্পদ, স্বার্থ ও প্রাণ দিতে ইতস্তত করেছিল। কাজেই এই বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর আচরণের সমালোচনা করার পর এখন তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হচ্ছে, তোমরা যে ঈমান গ্রহণ করার অংগীকার করেছো তা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব মেনে নেবার নাম নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ-ই যে তোমাদের জান ও তোমাদের ধন-সম্পদের মালিক এ অকাট্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব মেনে নেয়া ও এর স্বীকৃতি দেয়ার নামই ঈমান। এ অংগীকার করার পর যদি তোমরা এ প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হুকুমে কুরবানী করতে ইতস্তত করো, অন্যদিকে নিজের দৈহিক ও আত্মিক শক্তিসমূহ এবং নিজের উপায়-উপকরণসমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকো তাহলে এ থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমাদের অংগীকার মিথ্যা। সাচ্চা ঈমানদার একমাত্র তারাই যারা যথার্থই নিজেদের জান-মাল আল্লাহর হাতে বিকিয়ে দিয়েছে, তাঁকেই এসবের মালিক মনে করেছে। তিনি এগুলো যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন, সেখানে নির্দ্বিধায় এগুলো ব্যয় করে এবং যেখানে তিনি নিষেধ করেন, সেখানে দেহ ও আত্মার সামান্যতম শক্তিও এবং আর্থিক উপকরণের নগণ্যতম অংশও ব্যয় করতে রাযী হয় না।

(খ) يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ـ

"তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, অতঃপর মারে এবং মরে।"

সৃষ্টি যার আইন চলবে তার। এটাই ন্যায়সঙ্গত কথা। কিন্তু আল্লাহর তৈরী সৃষ্টি জগতের শুধুমাত্র জিন এবং মানুষ, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীনতা বা এখতিয়ার (ক্ষমতা) দিয়েছেন তারাই গোলমাল বাঁধায়। তারা নিজেদের ও শয়তানের মনগড়া আইন দ্বারা সমাজ চালাতে চেষ্টা করে এবং চালায়। আর যারা আল্লাহর হেদায়াত পেয়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যে জীবন বিধান আল-কুরআন দিয়েছেন সেই কুরআনের আইন মতে সমাজকে পরিচালনা করার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে আল্লাহদ্রোহীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহদ্রোহীরা মুমিনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সংঘর্ষে

ঈমানদাররা কাফেরদেরকে মারে এবং নিজেরাও মরে। তবে এ লড়াইয়ে ঈমানদারদের মৃত্যুটা আসলে মৃত্যু নয়। কারণ সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ -

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।"

আসলে তারাই শহীদ। শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। তবে নবী-রাসূলদের পরেই শাহাদাতের স্থান। اَقِيْمُوا الدِّيْنِ "দ্বীন কায়েম কর।" وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর।" জিহাদ করার জন্য আল-কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করেছেন।

(গ) وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ "তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর যিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদাবিশেষ।" আল-কুরআনের ওয়াদা আমরা অনেক জায়গায় পাই। যেমন সূরা আন-নিসা ৭৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

"দুনিয়ার জীবনের সুখ-সুবিধাকে যারা আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিতে পারে তারাই দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করার যোগ্য। আর দ্বীনের পথে সংগ্রাম করে যারা শহীদ হয় অথবা বিজয়ী হয়; তাদেরকে অচিরেই আমি মহা পুরস্কার দান করবো।"

বর্তমান দুনিয়ার ইহুদী ও নাসারাগণ বলছে তাওরাত ও ইনজীলে আল্লাহর

এ ওয়াদা নেই। বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে ইনজীল পাওয়া যায় সেগুলোতে হযরত ঈসা (আ)-এর এমন অনেকগুলো উক্তি পাওয়া যায় যা এ আয়াতের সমার্থক। যেমন :

"ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে। কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" (মথি, ৫ : ১০)

"যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।" (মথি, ১০ : ৩৯)

তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাতে এ বিষয়টি পাওয়া তো দূরের কথা, সেখানে আখেরাত, শেষ বিচার, পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির ধারণাই অনুপস্থিত। অথচ এ আকীদা সব সময় আল্লাহর সত্য দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান তাওরাতে এ বিষয়টির অস্তিত্ব না থাকার ফলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ঠিক নয় যে, যথার্থই তাওরাতে এর অস্তিত্ব ছিল না। আসলে ইহুদীরা তাদের পতন যুগে এতই বস্তুবাদী ও দুনিয়াবী সমৃদ্ধির মোহে এমন পাগল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের কাছে নিয়ামত ও পুরস্কার এ দুনিয়ায় লাভ করা ছাড়া তার আর কোন অর্থই ছিল না। এ কারণে আল্লাহর কিতাবে বন্দেগী ও আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে যেসব পুরস্কার দেবার ওয়াদা করা হয়েছিল সে সবকে তারা দুনিয়ার এ মাটিতেই নামিয়ে এনেছিল এবং জান্নাতের প্রতিটি সংজ্ঞা ও বৈশিষ্টকে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত ফিলিস্তীনের উপর প্রয়োগ করেছিল। তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমরা এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে পাই। যেমন :

"হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ-৬ : ৪, ৫)

"তিনি কি তোমার পিতা নহেন, যিনি তোমাকে লাভ করিলেন। তিনিই তোমার নির্মাতা ও স্থিতিকর্তা।" (দ্বিতীয় বিবরণ-৩২ : ৬)

কিন্তু আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কে যে পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, তোমরা এমন একটি দেশের মালিক হয়ে যাবে যেখানে দুধ ও মধুর নহর

প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ ফিলিস্তীন। এর আসল কারণ হচ্ছে, তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় বিদ্যমান তা প্রথমত সম্পূর্ণ নয়, তাছাড়া নির্ভেজাল আল্লাহর বাণী সম্বলিতও নয়। বরং তার মধ্যে আল্লাহর বাণীর সাথে অনেক ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে ইহুদীদের জাতীয় ঐতিহ্য, বংশপ্রীতি, কুসংস্কার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভুল ধারণা ও ফিক্‌হ ভিত্তিক ইজতিহাদের একটি বিরাট অংশ একই ভাষণ ও বাণী পরম্পরার মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর আসল কালামকে তার মধ্য থেকে পৃথক করে বের করে আনা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনে আলে ইমরানের দ্বিতীয় টীকা দেখুন)

শিক্ষা : ১। অস্থায়ী জান-মাল দিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাত খরিদ করার চুক্তি তাড়াতাড়ি করা উচিত। এ চুক্তির নামই বাইয়াত বা বিক্রয় চুক্তি।

২। যারা এ চুক্তি করেছে তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য বলেছেন। এ মহান ও সবচয়ে বড় সফলতার মূল্যায়ন করা উচিত।

বাস্তবায়ন : এ দারসের আলোকে আমাদের সকল ঈমানদার ভাইয়েরা আল্লাহর সাথে অস্থায়ী জান-মাল বিক্রি করে চিরস্থায়ী জান্নাত খরিদ করার চুক্তি বা বাইয়াত লিল্লাহ তাড়াতাড়ি করা উচিত। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৮

নফসের প্রতি
আল্লাহর পক্ষ থেকে পাপ-পুণ্যের ইলহাম

৯১. সূরা আশ-শামস

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১৫, রুকূ-১

আলোচ্য : ১-১০ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ـ (٢) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ـ (٣) وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ـ (٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ـ (٥) وَالسَّمَاءِ وَمَابَنٰهَا ـ (٦) وَالاَرْضِ وَمَاطَحٰهَا ـ (٧) وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ـ (٨) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ـ (٩) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ـ (١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "সূর্যের ও তার রোদের কসম। (২) চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। (৩) দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। (৪) রাতের কসম যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসে। (৫) আকাশের ও সেই সত্তার কসম যিনি একে নির্মাণ করেছেন। (৬) পৃথিবী ও সেই সত্তার কসম যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন। (৭) মানুষের নফসের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন; (৮) তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন। (৯) নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি যার নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে (১০) এবং যে তাকে কলুষাচ্ছন্ন করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।"

শব্দার্থ : اَلشَّمْسُ - সূর্য, ضُحٰى - সূর্যের আলো বা তাপ, قَمَرٌ - চাঁদ, تَلٰى -পিছনে আসা, نَهَارٌ - দিন, جَلٌّ - উজ্জ্বলতা, لَيْلٌ - রাতি, يَغْشٰى - আচ্ছাদিত

করে, سَمَاءٌ - আকাশ, بَنٰى - নির্মাণ করেছেন, اَرْضِ - জমিন, طَحٰى - বিছিয়েছেন, نَفْسٌ - নফস বা প্রাণ, سَوّٰى - সুবিন্যস্ত করা, اَلْهَمْ - প্রেরণ করা, জাগ্রত করা, فُجُوْرَ - অসৎকর্ম, تَقْوٰى - সৎকর্ম বা আল্লাহর ভয়, اَفْلَحَ - সফলকাম হলো, زَكّٰى - পরিশুদ্ধ করা হলো, خَابَ - ব্যর্থ হলো, دَسّٰى - কলুষাচ্ছন্ন করলো।

নামকরণ : এ সূরার প্রথম শব্দ (اَلشَّمْس) আশ্-শাম্সকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে الشمس। - অর্থ সূর্য।

নাযিলের সময়কাল : সূরার বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, সূরাটি মাক্কী। নবুওয়াতী জীবনের প্রথম পর্যায়ে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা চরমে উঠেছিল সেই সময় এটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ, নেকী ও বদীর (পাপ) পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর বদীর (পাপ) পথে চলার উপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের ক্ষেত্রে সূরাটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম থেকে দশ আয়াত পর্যন্ত প্রথম ভাগ। এগার আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

(এক) সূর্য-চন্দ্র, দিন-রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও বদী পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও তারা পরস্পর বিরোধী। এদের উভয়ের আকৃতি ও প্রকৃতি এক নয় এবং ফলাফলও এক হতে পারে না।

(দুই) মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে চেতনাহীনভাবে দুনিয়ায় ছেড়ে দেননি। তিনি একটি অতি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গুনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া এবং মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

(তিন) মানুষের মধ্যে পার্থক্যবোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে উদ্দীপিত করে আবার কোনটিকে ডুবিয়ে দেয়। এর উপরই তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সৎপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎ প্রবণতাগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের নফসকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীতপক্ষে যদি সে নফসের সৎপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসৎ প্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে ছামূদ জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দের যে চেতনালব্ধ জ্ঞান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিকে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং তাকে পুরাপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থেকেছে। তাই মহান আল্লাহ এই প্রকৃতিগত চেতনাকেই সাহায্য করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের উপর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ওহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গুনাহ কি তা জানাতে পেরেছেন। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ দুনিয়ায় নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এই ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম। তাঁকে ছামূদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ছামূদরা তাদের প্রবৃত্তির অসৎপ্রবণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড় বেশী হুকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মুজিযা দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উটনী পেশ করলেন এবং সতর্ক করে দিলেন, এর ক্ষতিসাধন করলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও এই জাতির সবচেয়ে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

সালেহ আলাইহিস সালামের মুকাবিলায় ছামূদ জাতির দুশ্চরিত্র লোকেরা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছিল, মক্কায় সে সময় সেই একই পরস্থিতি

বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় ছামূদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে আসলে তাদের এই ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবাসীদের সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ব্যাখ্যা : (ক) وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا - "সূর্যের ও তার রোদের কসম।" মূলে ضُحٰى - মানে সূর্যের আলো ও তাপ। এ সময়টি হচ্ছে সালাতুদ্ দুহা'র সময়, যখন সূর্য উদয়ের পরে যথেষ্ট উপরে উঠে যায়, উপরে উঠার পর শুধু আলোই বেড়ে যায় না, তাপও বিকীরণ করতে থাকে। তাই "দুহা" শব্দটি সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হলে তার আলো বা তার বদৌলতে যে দিনের উদয় হয় তা থেকে তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এর তুলনায় রোদ শব্দটি তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

(খ) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ـ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ـ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ـ "চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। দিনের কসম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে। রাতের কসম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়।" রাতের আগমনে সূর্য লুকিয়ে যায়। সারা রাত তার আলো দেখা যায় না। এই অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়। কারণ সূর্য দিগন্ত রেখার নীচে নেমে যাওয়াকেই রাত বলে। এর ফলে পৃথিবীর যে অংশে রাত নামে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না।

(গ) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا - "আকাশের ও সেই সত্তার কসম যিনি তা নির্মাণ করেছেন।" আকাশকে ছাদের মত পৃথিবীর বুকে উপরে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতে এবং এর পরের দুটি আয়াতে 'মা' (مَا) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ مَا بَنٰهَا، مَا سَوّٰهَا، مَا طَحٰهَا। মুফাস্‌সিরগণের একটি দল এই "মা" শব্দটিকে ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারা আয়াতগুলোর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন : আকাশ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কসম, পৃথিবী ও তাকে বিছিয়ে দেয়ার কসম এবং মানুষের নফস ও তাকে ঠিকভাবে গঠনকারী কসম। কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। কারণ এ তিনটি বাক্যের পরে নিম্নোক্ত বাক্যটি আনা হয়েছে : "তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন"। আর এ বাক্যটি

আগের বাক্য তিনটির সাথে খাপ খায় না। অন্য মুফাস্সিরগণ এখানে مَا-কে مَن মান বা الذين। (আল্লাযীনা)-এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই দ্বিতীয় অর্থটিই অধিকতর সঠিক মনে হয়। এর বিরুদ্ধে এ আপত্তি উঠানো ঠিক হতে পারে না যে, আরবী ভাষায় "মা" শব্দ প্রাণহীন বস্তু ও বুদ্ধিহীন জীবের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। খোদ কুরআনেই "মা"-কে "মান" অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (আর না তোমরা তাঁর ইবাদত কর যার ইবাদত আমি করি।) فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ۔ । কাজেই মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো বিবাহ করো)। ولا تنكحوا مانكح اباءكم (আর যেসব মেয়েকে তোমাদের বাপেরা বিবাহ করেছে তাদেরকে তোমরা বিবাহ করো না)।

(ঘ) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا. وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۔ "পৃথিবী ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। মানুষের নফসের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন।" ঠিকভাবে গঠন করেছেন মানে হচ্ছে, তাকে এমন একটি দেহ দান করেছেন, যা তার সুডৌল গঠনাকৃতি, হাত-পা ও মস্তিষ্ক সংযোজনের দিক থেকে মানবিক জীবন যাপন করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও ঘ্রাণ নেবার জন্য এমন ইন্দ্রিয় দান করেছেন যা তার বৈশিষ্ট্য ও আনুপাতিক কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে তার জন্য জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায়। তাকে চিন্তা ও বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি, যুক্তি উপস্থাপন ও প্রমাণ পেশ করার শক্তি, কল্পনাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, পার্থক্য করার শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি, সংকল্পশক্তি এবং এমন অনেক মানসিক শক্তি দান করেছেন যার ফলে সে এই দুনিয়ায় মানুষের মত কাজ করার যোগত্যা অর্জন করেছে। এছাড়া ঠিকভাবে গঠন করার মধ্যে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, তাকে জন্মগত পাপী ও প্রকৃতিগত বদমায়েশ হিসেবে তৈরী না করে বরং সহজ সরল প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তার গঠনাকৃতিতে এমন ধরনের কোন বক্রতা রেখে দেননি যা তাকে সোজা পথ অবলম্বন করতে

চাইলেও করতে না। এ কথাটিকেই সূরা রূমে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا - "সেই প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" (৩০ আয়াত)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটিই একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

"প্রত্যেক শিশুই প্রকৃতির (স্বভাবধর্ম ইসলামের) উপর পয়দা হয়। তারপর তার মা-বাপ তাকে ইহুদী, খৃস্টান ও অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন পশুর পেট থেকে সুস্থ সবল ও পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট বাচ্চা পয়দা হয়। তোমরা কি তাদের কাউকে কান কাটা পেয়েছো (বুখারী, মুসলিম)?" অর্থাৎ পরিবর্তী কালে মুশরিকরা তাদের জাহেলী কুসংস্কারের কারণে পশুদের কান কেটে দেয়। নয়তো আল্লাহ কোন পশুকে তার মায়ের পেট থেকে কানকাটা অবস্থায় পয়দা করেননি। অন্য এক হাদীসে নবী (সা) বলেন : "আমার রব বলেন, আমার সকল বান্দাকে আমি হানীফ (সঠিক প্রকৃতির উপর) সৃষ্টি করেছিলাম। তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাদের উপর এমন সব জিনিস হারাম করেছে যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছিলাম। শয়তানরা আমার সাথে শরীক করার জন্য তাদেরকে হুকুম দিয়েছে; অথচ আমার সাথে তাদের শরীক হবার ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি।" (মুসনাদে আহমদ, ইমাম মুসলিম)

(৬) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا - "তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।" মূলে (لَهْمٌ) লহ্‌ম শব্দ থেকে (اِلْهَامٌ।) অর্থ ইলহাম। لَهْمٌ শব্দের ফলে তারা এ বাক্যগুলোর অর্থ করেছেনে : যিনি আকাশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি পৃথিবীকে বিছিয়েছেন এবং যিনি মানুষের নফসকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কল্পনা বা চিন্তাকে অবচেতনভাবে বান্দার মন ও মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশে নামিয়ে দেয়ার জন্য পরিভাষা হিসাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মানুষের প্রতি তার পাপ এবং তার নেকী ও তাকওয়া ইলহাম করে দেয়ার দু'টি অর্থ হয়।

(এক) স্রষ্টা তার মধ্যে নেকী ও বদী উভয়ের ঝোঁকপ্রবণতা রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটি অনুভব করে। (দুই) প্রত্যেক ব্যক্তির অবচেতন মনে আল্লাহ্ এ চিন্তাটি রেখে দিয়েছেন যে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন জিনিস ভাল ও কোন জিনিস মন্দ, সৎ নৈতিক বৃত্তি ও সৎ কাজ এবং অসৎ নৈতিক বৃত্তি ও অসৎ কাজ সমান নয়, ফুজূর (দুষ্কৃতি ও পাপ) একটি নিকৃষ্ট আচরণ এবং তাকওয়া (খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা) একটি উত্তম আচরণ, এ চিন্তাধারা মানুষের জন্য নতুন নয়, বরং তার প্রকৃতি এগুলোর সাথে পরিচিত। স্রষ্টা তার মধ্যে জন্মগতভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

সূরা আদ্-দাহ্রে এভাবে বলা হয়েছে :

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ـ

"আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।" (আয়াত-৩)

সূরা আল-বালাদে বলা হয়েছে : وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ - "আর আমি (ভাল ও মন্দ) উভয় পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।" (আয়াত-১০)

সূরা আল-কিয়ামাতে বলা হয়েছে : "মানুষের মধ্যে একটি নফ্সে লাওয়ামাহ্ (বিবেক) আছে। মানুষ অসৎ কাজ করলে সে তাকে তিরস্কার করে। (আয়াত-২)

সূরা আল-কিয়ামাতে আরও বলা হয়েছে : আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওযর পেশ করুক না কেন, সে নিজের ব্যাপারে খুব ভাল করেই জানে। (দ্র. আয়াত-১৪-১৫)

মহান আল্লাহ স্বভাবজাত এবং প্রকৃতিগত ইলহাম করেছেন প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তার মর্যাদা, ভূমিকা ও স্বরূপ অনুযায়ী। যেমন সূরা ত্বা-হা-এ বলা হয়েছে :

اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى - "যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন।" (৫০ আয়াত)

যেমন প্রাণীদের প্রত্যেক প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। এর ফলে মাছ নিজে নিজেই সাঁতার কাটে। পাখী উড়ে বেড়ায়। মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে। চাতক বাসা বানায়। মানুষকেও বিভিন্ন পর্যায় ও ভূমিকার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষকে প্রাণী হিসেবে যে ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই মায়ের স্তন চুষতে থাকে। আল্লাহ যদি প্রকৃতিগতভাবে (ফিতরাত) তাকে এ শিক্ষা না দিতেন তাহলে তাকে এ কৌশল শিক্ষা দেবার সাধ্য কারো ছিল না। অন্যদিকে মানুষ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। সৃষ্টির শুরু থেকেই অনবরত আল্লাহ তায়ালা তাকে ইলহামী পথনির্দেশনা দিয়ে আসছেন। এর ফলে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে একের পর এক মানব সভ্যতা বিকাশ সাধন করছে।

মানুষ নৈতিক জীব হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার শক্তি ও ভাল-মন্দের অনুভূতি ইলহাম করেছেন। আবহমান কাল থেকে প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক জায়গায় ভালোর পুরস্কার ও মন্দের শাস্তির বিধান জারী আছে। এর অস্তিত্বই এর স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ। জড় জগতের কোথাও এসব নিয়মনীতির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না।

(চ) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا - "নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে সেই ব্যক্তি যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে কলুষাচ্ছন্ন সে ব্যর্থ হয়েছে।"

একথা প্রমাণ করার জন্য তিনি হাতের কাছের সর্বজন পরিচিত এমন কিছু জিনিষ পেশ করেন যা মানুষ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে দেখে। এখানে এক এক জোড়া জিনিস নিয়ে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে। তারা পরস্পর বিপরীতধর্মী, কাজেই তাদের প্রভাব ও ফলাফলও বিপরীতধর্মী। একদিকে সূর্য অন্যদিকে চাঁদ। সূর্যের আলো ও তাপ প্রখর। এর তুলনায় চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের উপস্থিতিতে চাঁদ আকাশে থাকলেও অনুজ্জ্বল থাকে। সূর্য ডুবে যাবার পর সে উজ্জ্বল হয়েও রাতকে দিন বানিয়ে দিতে পারে না।

এভাবে দিন ও রাত পরস্পর বিপরীত। উভয়ের প্রভাব ও ফলাফল এত বেশী বিভিন্ন যে, এদেরকে কেউ একসাথে জমা করতে পারে না। তেমনি উর্ধ্বে স্থাপিত আকাশ আর নিম্নে বিছানো যমীন উভয়ের কাজ, প্রভাব ও ফলাফলে বিস্তর ফারাক।

মানুষের শরীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার অংগ-প্রত্যংগ, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলোকে আনুপাতিক ও সমতাপূর্ণ মিশ্রণের মাধ্যমে সুগঠিত করে স্রষ্টা তার মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রবণতা রেখে দিয়েছেন। এগুলো পরস্পর বিপরীতধর্মী। ইলহামী তথা অবচেতনভাবে তাকে এদের উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। এদের একটি ফুজূর (দুষ্কৃতি), তা খারাপ আর অন্যটি হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি), তা ভাল। যদি সূর্য-চন্দ্র, রাত-দিন ও আকাশ-পৃথিবী, তাদের প্রভাব ও ফলাফল অনিবার্যভাবে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকে তাহলে মানুষের নফসের দুষ্কৃতি ও তাকওয়া পরস্পরের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও এক হতে পারে কেমন করে? মানুষ নিজেই তো নেকী ও পাপকে এক মনে করে না। যদিও বা কোন মানুষ নিজের মনগড়া দর্শনের দৃষ্টিতে ভাল-মন্দের মানদণ্ড তৈরী করে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে চায়। কিন্তু আসল ফায়সালা তো মানুষের হাতে নেই। গুনাহ ও তাকওয়া ইলহামকারীর হাতেই রয়েছে আসল ক্ষমতা। যে নিজের নফসের পরিশুদ্ধি করবে সে সফলতা লাভ করবে। আর যে নিজের নফসকে কলুষাচ্ছন্ন করবে সে ব্যর্থ হবে।

যাক্কাহা ও দাস্‌সাহা-র কর্তা হচ্ছে বান্দা, আল্লাহ নন। সূরা আল-আ'লার ৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - "সফল হয়েছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে।" (৮৭ : ১৪)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ـ

"হে আল্লাহ! আমার নফ্‌সকে তার তাকওয়া দান করো এবং তাকে পবিত্র করো। তাকে পবিত্র করার জন্য তুমিই সর্বোত্তম সত্তা। তুমিই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক।"

শিক্ষা : (১) আল্লাহ তায়ালা মানুষের পাপ-পূণ্য তার প্রতি ইলহাম করেছেন। পাপ ও পুণ্যের কাজ, প্রভাব ও ফলাফল তেমনি বিপরীত, যেমনি চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন ও আস্‌মান-যমীনের কাজ, প্রভাব ও ফলাফল।

(২) সেই সফল হয়েছে যে তার নফ্‌সকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সেই ব্যর্থ হয়েছে যে তার নফ্‌সকে কলুষিত করেছে।

(৩) নিজের নফসকে অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

বাস্তবায়ন : এ দারসের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যে প্রত্যেক বান্দার মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের সীমা রেখা ইলহাম করেছেন সেই ইলহামী জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের নফসকে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করে পরিশুদ্ধ অবস্থায় আখেরাতে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছতে পারি, এ তাওফীক কামনা করে এখানে আমার দারস শেষ করছি। আমীন।

ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৯

কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়

৬১. সূরা আসসাফ্

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-১৪, রুকূ-২

আলোচ্য : ১০-১৩ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(١٠) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - (١١) تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ - ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - (١٢) يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ - ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (١٣) وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا - نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ - وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১০) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি (লাভজনক) ব্যবসার সন্ধান দেবো, যা তোমাদের কঠোর আযাব থেকে বাঁচবে? (১১) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করো তোমাদের জান ও মাল দিয়ে, এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা বুঝ। (১২) আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তিনি তোমাদের আরও প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসের পবিত্র ঘরসমূহে, আর এটাই সবচাইতে বড় সাফল্য। (১৩) সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে। আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আপনি ঈমানদারদের সুসংবাদ দিন।

শব্দার্থ : اَدُلُّكُمْ - আমি তোমাদের সন্ধান দেব, تِجَارَةٌ - ব্যবসা, تُنْجِيْكُمْ - তোমাদের মুক্তি দেবে, اَلِيْمٌ - কষ্টদায়ক, تُؤْمِنُوْنَ - তোমরা ঈমান আনো। تُجَاهِدُوْنَ - তোমরা জিহাদ করো, سَبِيْلِ - পথে, بِاَمْوَالِكُمْ - তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে, اَنْفُسِكُمْ - তোমাদের জীবন দিয়ে, تَعْلَمُوْنَ - বুঝ, يَغْفِرْ - তিনি ক্ষমা করবেন, ذُنُوْبَ - গুনাহসমূহ, يُدْخِلْكُمْ - তিনি তোমাদের প্রবেশ করাবেন, تَجْرِىْ - প্রবাহিত হয়, تَحْتِهَا - তার পাদদেশে, اَنْهٰرُ - ঝর্ণাসমূহ, مَسٰكِنَ - বাসগৃহসমূহ, طَيِّبَةً- পবিত্র, عَدْنٍ - চিরস্থায়ী; একটি জান্নাতের নাম, اَلْفَوْزُ - সাফল্য, اُخْرٰى - অন্য, تُحِبُّوْنَهَا - যা তোমরা পছন্দ কর, نَصْرٌ - সাহায্য, فَتْحٌ - বিজয়, قَرِيْبٌ - আসন্ন, بَشِّرْ - আপনি সুসংবাদ দিন।

নামকরণ : এই সূরার ৪ নং আয়াতে صَفًّا - শব্দটিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। صف (সফ্) শব্দের অর্থ কাতার বা সারি।

নাযিল হওয়ার সময় : সূরাটি কোন সময় যে নাযিল হয়েছে তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলেনি। তবে সূরার বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি উহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালে অবতীর্ণ হয়ে থাকবে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের উপর প্রকৃত ও নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান পোষণ করা এবং ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

শানে নুযূল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমরা একদিন মসজিদে নববীতে বসে পরস্পর আলোচনা করছিলাম, আমাদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞাসা করার জন্য কেউ রাযী হয়নি। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত আমাদের নিকট আসলেন এবং এক এক করে

প্রত্যেককে নাম ধরে ডেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আমরা সবাই একত্র হলে তিনি এই পূর্ণ সূরাটি আমাদের পাঠ করে শুনান।" (এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ওহীর মাধ্যমে তাদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানতে পারেন)। সাহাবাগণ সবচেয়ে প্রিয় যে আমলটির সন্ধান-করছিলেন, সেটি এই সূরাতেই উল্লেখ আছে। তা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।

ব্যাখ্যা : (ক) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করবে?" এখানে ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন যে, জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে আল্লাহ্ তায়ালা ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। ব্যবসা করার জন্য পুঁজি হিসেবে ধনসম্পদ, সময়, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা বিনিয়োগ করতে হয়। তারপর দুনিয়ার এ ব্যবসায় কোন সময় লাভ হয়, আবার কোন সময় ক্ষতি বা লোকসান হয়।

(খ) تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ -

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তোমাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো।" আর আল্লাহ্ তায়ালা যে ব্যবসার কথা বলছেন, এ ব্যবসায়ে পুঁজি হবে দু'টি– (১) ঈমান আর (২) জিহাদ। এ দুই পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করলে কোন লোকসান নেই; শুধু লাভ আর লাভ। সূরা তওবায় এভাবে বলা হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিন লোকদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। আর তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে এবং মারে ও মরে।"

আল্লাহ তায়ালা এখানেও জিহাদকে ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। মুমিন লোকদের পুঁজি হলো জান-মাল, আর আল্লাহর কাছে এর বিনিময় জান্নাত। মুমিনেরা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শত্রুদেরকে হত্যা করে, আবার কখনও নিজেরাও নিহত হয় শুধু জান্নাতের আশায়। জান্নাত দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে করেছেন।

ঈমানদারদেরকে পুনরায় ঈমান আনতে বলার তাৎপর্য হলো : মুখে মুখে শুধু ঈমানের দাবীকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক হবে না, বরং ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুখময় জান্নাত পাওয়ার জন্য যে ব্যবসার কথা আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন তার মূল পুঁজি হলো ঈমান ও জিহাদ। দুর্বল ঈমান নিয়ে আল্লাহর ঘোষিত ব্যবসা করা কোন মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রথমেই تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه বলে মযবুত ঈমান আনার শর্ত আরোপ করেছেন। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান কালে ইসলামী আন্দোলন এই জিহাদেরই একটি স্তর। আল-হাদীসের আলোকে জিহাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

وَعَنْ اَبِىْ ذَرَّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"আবু যার (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর পথে জিহাদ।" (বুখারী ও মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَغُدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : "আল্লাহর পথে জিহাদে একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা পরিমাণ সময় ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে উত্তম।" (বুখারী ও মুসলিম)

(গ) ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - "এই জিহাদের ব্যবসা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা এর গুরুত্ব অনুভব কর।" এক শ্রেণীর মানুষ এই দুনিয়ার জীবনকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করে, ইসলামের আইনের বাধ্যবাধকতা মানে না। অথচ তাদের জীবন চলে যাচ্ছে, কোন অসুবিধা হয় না। এভাবে ফাঁকি দিয়ে আখেরাতে তারা জান্নাতে যেতে চায়। অথচ আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দিয়ে সহজ কোন পথে জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা রাখেননি। এ বিষয়ে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ -

"তোমরা কি ভেবেছো তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনও পরীক্ষা করে দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।" (আলে ইমরান : ১৩৮ আয়াত)। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত ঈমানদার এবং জিহাদের গুরুত্ব বুঝে এমন লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং জান্নাতে যাবার সহজ সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

(ঘ) يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ - ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

"তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এমন একটি বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে পবিত্রতম বালাখানাসমূহ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এটা বড় সাফল্য।"

আল্লাহর শিখানো এ ব্যবসায়ে কোন লোকসান নেই, তবে প্রধান লাভ চারটি– দুনিয়াতে– (১) অতীতের সকল অপরাধের ক্ষমাপ্রাপ্তি; (২) আল্লাহর সাহায্য ও দ্বীন ইসলামের বিজয়।

আর দু'টি আখেরাতে– (১) কঠোর আযাব থেকে নিষ্কৃতি; (২) জান্নাতের মধ্যে পবিত্রতম বালাখানাসমূহ লাভ।

আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে যারা মারা যায় তাদেরকে শহীদ বলা হয়। মহানবী (সা) বলেন, আল্লাহর নিকট শহীদ ব্যক্তিদের জন্য ছয়টি প্রতিদান রয়েছে :

(১) প্রথম রক্তপাতেই তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে, (২) জান্নাতে তার বাসস্থান তাকে দেখানো হবে, (৩) কবরের আযাব তাকে স্পর্শ করবে না, (৪) বড় বিপদ-আপদে সে নিরাপদ থাকবে, (৫) তার মাথায় মূল্যবান মুকুট পরানো হবে এবং (৬) সত্তরজন গুনাহগার আত্মীয়ের শাফায়াতের অনুমতি পাবে।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ - وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ - (৬)

"সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অতি নিকটবর্তী। তুমি ঈমানদারদের সুসংবাদ দাও।"

জান্নাতের অধিবাসীগণ সেখানে যখন যা চাইবে তাই পাবে। এ পাওয়াতে কোন বিলম্ব হবে না। আর দুনিয়ার জীবনে যারা ঈমান ও জিহাদের শর্ত পূরণ করতে পারবে তাদের বেলায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা আসবে এবং তাদের অবশ্যম্ভাবী বিজয় অতি নিকটবর্তী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসংগে সূরা আন্-নূরের ৫৫নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের

সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।"

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মযবুত ঈমান ও জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, এ দুই শর্ত পূরণ করতে পারলে আল্লাহ অতীতের ন্যায় বর্তমানেও মুসলমানদের খেলাফত দান করবেন। মেহেরবান আল্লাহ পরকালীন সাফল্যের আগে দুনিয়ার কামিয়াবীও দান করবেন।

শিক্ষা : সূরা সফ্-এর (১০-১৩) এ তিনটি আয়াতের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তা নিম্নে দেয়া হলো :

১। পরকালের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে ব্যবসার কথা বলেছেন তা হলো ইসলামী আন্দোলন।

২। ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করার জন্য মযবুত ঈমান ও জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

৩। আল্লাহ নির্দেশিত এ ব্যবসায় কোন লোকসান নেই, শুধু লাভ আর লাভ। এখানে চারটি লাভের উল্লেখ আছে : (ক) গুনাহসমূহের ক্ষমা, (খ) জান্নাত লাভ, (গ) জান্নাতের পবিত্র ও চিরস্থায়ী বালাখানাসমূহ, (ঘ) আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়।

বাস্তবায়ন : আমরা যারা ঈমানদার তাদের অবশ্যই আল্লাহর শিখানো তিজারত গভীর আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা উচিত। তাহলে আমরা ইহকাল ও পরকালে অধিক লাভবান হবো, মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় সমস্যারও সমাধান হবে। ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদের অভাবেই আজ আমরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা ও সারা বিশ্বে বিজয়ী জাতি হিসেবে দাঁড়াতে হলে ইসলামী আন্দোলনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

দারস : ১০

আপন পরিবারে শত্রু, ধনসম্পদ ও সন্তান পরীক্ষার বস্তু, অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্তি

৬৪. সূরা আত্-তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-১৮, রুকূ-২

আলোচ্য : ১৪-১৮ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (١٥) اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ - (١٦) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (١٧) اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ - (١٨) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে) (১৪) "হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থেকো। আর যদি তোমরা তাদের ক্ষমা করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের মাফ কর তাহলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (১৫) তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে পরীক্ষা বিশেষ। অবশ্যই আল্লাহর কাছে

মহা পুরস্কার রয়েছে। (১৬) অতএব তোমরা তোমাদের সাধ্য মোতাবেক আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা শোন, আনুগত্য কর ও খরচ কর, এতে তোমাদের নিজেদের জন্যই রয়েছে কল্যাণ, যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েক গুন বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল। (১৮) গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

শব্দার্থ : اَزْوَاجٌ - স্ত্রীগণ, اَوْلاَدٌ - সন্তানগণ, عَدُوًّا - শত্রু, দুশমন, فَاحْذَرُوْا - তোমরা সাবধান থেকো, تَعْفُوْا - ক্ষমা কর, وَتَصْفَحُوْا - উপেক্ষা কর, وَتَغْفِرُوْا - ক্ষমা করে দাও, غَفُوْرٌ - অতিশয় ক্ষমাশীল, رَحِيْمٌ - দয়াবান, اَمْوَالٌ - ধনমাল, فِتْنَةٌ - পরীক্ষা, বিপর্যয়, عِنْدَهٗ - তার নিকট, اَجْرٌ - পুরস্কার, عَظِيْمٌ - মহান, বিরাট, বড়, فَاتَّقُوْا - অতএব তোমরা ভয় কর, مَااسْتَطَعْتُمْ - তোমাদের সাধ্যানুসারে, اِسْمَعُوْا - তোমরা শোন, اَطِيْعُوْا - তোমরা আনুগত্য কর, اَنْفِقُوْا - খরচ কর, خَيْرًا - উত্তম, لِاَنْفُسِكُمْ - তোমাদের নিজেদের জন্য, يُوْقَ - রক্ষা পেল, شُحَّ - সংকীর্ণতা, কার্পণ্য نَفْسِهٖ - তার মনের, مُفْلِحُوْنَ - সফলকাম, تُقْرِضُوْا - তোমরা কর্য দাও, حَسَنًا - উত্তম, يُضٰعِفْهُ - তা বহু গুনে বৃদ্ধি করবেন, يَغْفِرْ - মাফ করবেন, شَكُوْرٌ - গুণগ্রাহী, কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী, حَلِيْمٌ - ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু عَالِمٌ - জ্ঞানী, غَيْبِ - অদৃশ্য, اَلشَّهَادَةِ - প্রকাশ্য; দৃশ্যমান, اَلْعَزِيْزُ - মহাপরাক্রমশালী, اَلْحَكِيْمُ - প্রজ্ঞাময়।

নামকরণ : সূরার ৯ নং আয়াতের ذلك يوم التغابن অংশের تغاون শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। تغاون - অর্থ হার-জিত।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : মুকাতিল ও কালবী বলেন, সূরাটির প্রথম কিছু অংশ মক্কায় আর শেষ অংশের কিছু পরিমাণ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, শুরু থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মাক্কী এবং ১৪ থেকে শেষ পর্যন্ত মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ পূর্ণ সূরাটিই মাদানী, হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় এমন কোন ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এর মূল বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে একটা ধারণা জন্মে যে, তা হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। এ কারণেই হয়তো এতে কিছুটা মাক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মাদানী সূরার ভাবধারা বিদ্যমান।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : ঈমান ও আনুগত্যের আহ্বান এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান এই সূরার মূল বিষয়বস্তু। ১-৪ আয়াতে সমস্ত মানুষকে, ৫-১০ আয়াতে কাফেরদেরকে এবং ১১-১৮ আয়াতে ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে।

সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে নিম্নে চারটি মৌলিক বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

প্রথম : এ বিশ্বলোক কোন প্রতিপালক ও পরিচালকহীন নয়। এক আল্লাহ, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, সর্বোতভাবে নিখুঁত ও ত্রুটিহীন, তাঁর উদাত্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে এ সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকটি ছোট বড় জিনিস।

দ্বিতীয় : এ সৃষ্টিজগত সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পৃথিবী একটা অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন তামাশার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে মনে করে তোমরা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়ো না। رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا আল্লাহ এ পৃথিবীর কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি।

তৃতীয় : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করার পর কুফর ও ঈমান এ দু'টির যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কুফর ও ঈমানের পরিণতির কথা বিবেচনা করে তোমাদের স্বাধীনতাকে বা এখতিয়ার-ক্ষমতাকে কিভাবে কাজে লাগাও, তাই আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান।

চতুর্থ : মানুষ তার দায়িত্বের ব্যাপারে জওয়াবদিহি থেকে মুক্ত নয়। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।

মানুষ সম্পর্কে এ চারটি মৌলিক কথা বলার পর কুফর-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ইতিহাসে দেখা গেছে, জাতির পর জাতি পৃথিবীতে আবিভূত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ মাত্র দু'টি। (এক) আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে যেসব নবী ও রাসূল পাঠিয়েছিলেন, মানুষ তাদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তারা মনগড়া মতবাদ রচনা করে একটি বিভ্রান্তি থেকে আরেকটি চরম বিভ্রান্তির দিকে চলছে। (দুই) তারা পরকাল অস্বীকার করে এ দুনিয়ার জীবনই সবকিছু চূড়ান্তভাবে এই কথা মেনে নিয়েছে। জবাবদিহির দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তাদের গোটা জীবনের আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের জঘন্য চরিত্র ও স্বভাবের পংকিলতা এতই মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাব এসে তাদের কবল থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করছে।

সত্য অমান্যকারীদের এই বলে আহ্বান জানানো হয়েছে যে অতীত কালের দ্বীন অমান্যকারীদের পরিণতির অনুরূপ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনা তাদের উচিত। লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, সেই দিনটি অবশ্যই আসবে যেদিন সর্বকালের সকল মানুষকে একত্র করা হবে। “লেইউরাও আ'মালাহুম” তাদের সকল আমল ভাল-মন্দ, ছোট-বড় দেখানো হবে, সব প্রকাশিত হয়ে যাবে। কোন কোন লোক ঈমান ও নেক আমলের পথ অনুসরণ করে চির জান্নাতী হবে। আর কেউ কুফরী পথে চলে চির জাহান্নামী হবে। তারপর ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেয়া হয়েছে।

১। বিপদ আল্লাহর অনুমতিক্রমেই আসে। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি ঈমানের উপর অবিচল থেকে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। মসিবতের সময় ঘাবড়ে গিয়ে যে ঈমানের পথ থেকে

বিচ্যুত হবে, তার বিপদ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া দূর হতে পারে না। অবশ্য সে এরূপ করে অপর একটি অতি বড় বিপদ ডেকে আনে। আর তা হলো তার দিল আল্লাহর হিদায়াত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়।

২। মুমিন ব্যক্তির ঈমান আনাই শেষ নয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করা তার একান্ত কর্তব্য। আনুগত্য ও অনুসরণ বাদ দিলে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, সেজন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কেননা রাসূলে কারীম (সা) নিজে সত্য দ্বীন পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

৩। মুমিনের ভরসা দুনিয়ার কোন শক্তি-সামর্থ্যের উপর থাকে না। মুমিনকে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে।

৪। মুমিনের জন্য তার বংশ, পরিবার ও ধন-মাল এক বড় পরীক্ষা। কেননা এসব জিনিসের মায়ায় পড়েই মানুষ ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ হতে বিরত থাকে ও বিপরীত পথে চলতে বাধ্য হয়। এ কারণে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য, নিজের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকা যেন কোন আপনজন তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খোদার পথ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে। তাদের ধন-মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকা কর্তব্য, মন যেন অর্থপূজায় নিমজ্জিত হতে না পারে।

৫। প্রত্যেক মানুষ তার সামর্থ্যনাযায়ী শরীয়াত পালনের জন্য দায়িত্বশীল। মানুষ নিজের সামর্থ্যের বাইরে কাজ করবে তা আল্লাহ তায়ালা চান না। অবশ্য প্রত্যেককে সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করাও অনুচিত। নিজের ত্রুটির কারণে আল্লাহ নির্ধারিত সীমা যেন লঙ্ঘিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

ব্যাখ্যা : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদরে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা অনুশীলন কর এবং ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

অর্থাৎ পার্থিব সম্বন্ধের দিক দিয়ে যদিও এরা তোমাদের বন্ধু, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে এরা তোমাদের শত্রু হতে পারে। তারা তোমাদেরকে সৎ ও পুণ্য কাজে বাধা দেয়, অসৎ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে বা ঈমান থেকে বিরত রাখে ও কুফরীর দিকে আকৃষ্ট করে। এসব এমন ব্যাপার যে সম্পর্কে তোমাদের সাবধান থাকা প্রয়োজন। এদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে নিজের পরিণাম বিনষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তোমরা তাদেরকে শত্রু মনে করে তাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে থাকবে। বরং আসল কথা এই যে, যদি তাদের সংশোধন করতে না পারো তবে অন্তুতপক্ষে তাদের আকর্ষণ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাদের সাথে কোনরূপ কঠোরতা ও রুঢ় আচরণ করবে না; বরং নম্রতা ও ক্ষমা-সহিষ্ণুতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবে।

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহই এমন এক সত্তা যাঁর নিকট বিরাট প্রতিদান রয়েছে।"

এক্ষেত্রে রাসূলে কারীম (সা)-এর একটা বাণীও স্মরণীয়। তাবারানী হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলের কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন : "তোমাদের আসল শত্রু সে নহে যাকে হত্যা করলে তোমরা সফল হবে, আর সে তোমাদের হত্যা করলে তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হবে। বরং আসল শত্রু হতে পারে তোমার সেই সন্তান যে তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর তোমার বড় শত্রু হচ্ছে তোমার সে ধন-সম্পদ যার তুমি মালিক হয়েছ।"

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা এখানে বলেছেন, তোমরা যদি ধন-সম্পদ ও সন্তানের বিপদ হতে নিজকে বাঁচিয়ে রাখতে পার এবং তাদের প্রেম-ভালবাসার উপর আল্লাহর ভালবাসাকে বিজয়ী রাখতে সক্ষম হও, তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট অতি বড় মূল্য ও শুভ ফল হবে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ - وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"তোমরা তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় কর, আর শোন, আনুগত্য কর ও খরচ কর, তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফল।"

সূরা আল-ইমরানের ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে :

اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ "আল্লাহকে এমনভাবে ভয় কর যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত।" সূরা আল-বাকারার ২৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।" আর এখানে বলা হয়েছে "তোমাদের সাধ্যে যতটা কুলায় আল্লাহকে ভয় কর।"

এ তিনটি আয়াতের মর্ম একত্রে বিবেচনা করলে মনে হয়, প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার এমন একটা মানদণ্ড আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রত্যেক মুমিনের চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয় আয়াত আমাদেরকে এ নীতিগত শিক্ষা দেয় যে, কারও নিকট তার সাধ্য-সামর্থের অধিক কাজ আদায় করার দাবী করা হয়নি, বরং আল্লাহর দ্বীনে মানুষ শুধু ততটুকুর জন্যই দায়ী যতটুকু করার সাধ্য তার আছে। আয়াতটি প্রত্যেক মানুষকে হিদায়াত দেয় যে, সে যেন নিজের সাধ্যানুযায়ী তাকওয়া গ্রহণের চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি না করে। তার পক্ষে যতদূর সম্ভব আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলা তার কর্তব্য ও তাঁর নাফরমানী হতে বিরত থাকা উচিত। এ বিষয়ে সে নিজে যদি অবহেলা করে তাহলে সে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে না। তবে যা তার সাধ্যের বাইরে, সেজন্য তাকে দায়ী করা হবে না।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অনুগ্রহ, সুযোগদান ও সাহায্য ছাড়া কোন ব্যক্তিই কেবল নিজের বাহুবলে অন্তরের ঐশ্বর্য অর্জন করতে পারে না। মূলত তা আল্লাহর একটি দান, একটি অতুলনীয় নেয়ামত। আল্লাহর সুযোগ দান এবং

কেবলমাত্র তাঁরই সাহায্য-সহযোগিতায় একজন তা লাভ করতে পারে। شُحٌّ - শব্দটি আরবী ভাষায় কার্পণ্য বা কৃপণতা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ শব্দটিকে যখন "নফস" শব্দের সাথে সম্পর্কিত করে شح النفس - বলা হবে তখন তা দৃষ্টিসংকীর্ণতা, সংকীর্ণমনা ও অন্তরের ক্ষুদ্রত্বের অর্থ ব্যক্ত করে। আর এ অর্থ কার্পণ্য হতেও অনেক ব্যাপক। বরং কার্পণ্যেরও মূল উৎস এগুলোই। এ মানসিকতার কারণে মানুষ অন্য লোকের অধিকার স্বীকার করা ও আদায় করা তো দূরের কথা, তার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিতেও প্রস্তুত হয় না। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু তারই হয়ে থাকুক। অন্যকে দিবে তা তো দূরের কথা, অন্য কেউ কাকেও যদি কিছু দেয়, তবে তাতেও তার মন কষ্ট পায়। তার লোভ কেবল নিজের পাওনা পেয়েই ক্ষান্ত হয় না, অন্যদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করাটাও একান্ত জরুরী মনে করে। সে চায় চারদিকে যা কিছু ভাল জিনিস রয়েছে, তা সবই সে গ্রাস করে নেবে, আর কারও জন্য কিছু রেখে দেবে না।

কুরআন মজীদে এ খারাপ মানসিকতা থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়াকে কল্যাণের নিয়ামক বলা করা হয়েছে। আর রাসূলে কারীম (সা) একে অত্যন্ত খারাপ ও নিকৃষ্টতম মানসিকতার মধ্যে গণ্য করেছেন। আর এটাই হলো সব বিপর্যয়ের উৎস।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন : "তোমরা সকলে লোভাতুর কার্পণ্য থেকে বেঁচে থাক। কেননা লোভাতুর কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে নিজেদের রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এরই প্ররোচনায় তাদের জন্য নিষিদ্ধ হারাম জিনিসগুলোকে হালাল করে নিয়েছে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন : "ঈমান ও লোভাতুর কার্পণ্য কারও দিলে একত্র হতে পারে না।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : "দু'টি স্বভাব কোন মুসলমানের মধ্যে একত্র হতে পারে না, চরিত্রহীনতা ও কার্পণ্য।"

ইসলামের এ আদর্শ শিক্ষার ফলেই কিছু কিছু লোকের কথা বাদ দিয়ে মুসলমানরা একটা জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে আজও অন্যদের তুলনায় অধিক দানশীল ও উদার হৃদয়। যেসব জাতি সারা দুনিয়ায় সংকীর্ণ মানসিকতা ও কার্পণ্যের দিক দিয়ে তুলনাহীন, স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে আসা লক্ষ কোটি মুসলমান নিজেদের স্ববংশীয় অমুসলমানদের পাশাপাশি বসবাস করছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে দিলের উদারতা ও সংকীর্ণতার মাপকাঠিতে যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তার এ একটি মাত্র ব্যাখ্যাই দেয়া চলে এবং এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়াই সম্ভব নয় যে, একমাত্র ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই মুসলমানদের দিলকে উদার, বিশাল ও প্রশস্ততর করে দিয়েছে।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ.

"তোমরা যদি আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তবে তিনিই তোমাদেরকে কয়েক গুন বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী ও ধৈর্যশীল।"

করযে হাসানা অর্থাৎ উত্তম ঋণ। এমন ঋণ যা হালাল উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে দেয়া হয়। নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে খরচ করলে আল্লাহ তাকে নিজের জন্য ঋণ বলে গণ্য করেন। দানকারীকে তিনি কেবল আসল নয়, বরং কয়েক গুণ বেশী দেয়ার ওয়াদা করেন। তবে এজন্য তিনি শর্ত আরোপ করে বলেন যে, করযে হাসানা এমন ঋণ হতে হবে যার পিছনে কোন স্বার্থ জড়িত থাকবে না। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে হবে। কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ঋণ দিতে হবে।

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিজয়ের পূর্বে দান করেছে ও লড়াই করেছে, সে এবং বিজয়ের পরে দানকারী ও লড়াইকারী সমান নয়। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী। ইসলাম যখন শত্রুদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল, তার সমর্থকরা যখন ছিল সংখ্যায় কম এবং কোন লাভ, সুখ

ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হতো না, তখন যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য দান করেছে ও লড়াই করেছে, সে ঐ ব্যক্তির সমপর্যায়ের নয়, যে ইসলামের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশ, বিপুল সংখ্যক সমর্থক এবং সাফল্য ও বিজয় নাগালের মধ্যে থাকা অবস্থায় দান ও লড়াই করে।

সহীহ বুখারীতে একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা আমার সাথীদের গালি দিও না। আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে দান কর, তবুও তাদের সমান, এমনকি তাদের অর্ধেক মর্যাদাও পাবে না। (আমার সাথী বলে প্রবীণ সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে।)

সূরা আল-হাদীদের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ـ

"তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে তোমরা ব্যয় কর। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং অর্থ ব্যয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।"

সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

"তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, যাতে আল্লাহ তা কয়েক গুন বাড়িয়ে তাকে ফেরৎ দেবেন? কমাবার ও বাড়াবারও ক্ষমতা আল্লাহর আছে এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

শিক্ষা : সূরা আত্-তাগাবুনের (১৪-১৮) এ পাঁচটি আয়াতের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তা নিম্নে বর্ণিত হলো।

১। ঈমানদার লোকদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কতক তাদের দুশমন হতে পারে। এদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। নম্রতা, ক্ষমা ও

সহিষ্ণুতার মাধ্যমে এদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। সংশোধন না হলে অন্তুতপক্ষে তাদের আকর্ষণ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

২। আমরা নিজেদের ধন-সম্পদ ও সন্তানের ভালবাসার উপর আল্লাহর ভালবাসাকে বিজয়ী রেখে আল্লাহর নিকট থেকে অতি বড় মূল্য ও শুভফল আশা করবো।

৩। নিজের সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় করে সকল কাজ আঞ্জাম দেবে।

৪। লোভাতুর কার্পণ্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে আল্লাহর পথে খরচ করলেই আল্লাহ কয়েক গুন বাড়িয়ে দেবেন এবং কল্যাণ ও সাফল্যের পথে নিয়ে যাবেন।

বাস্তবায়ন : আমরা যারা ঈমানের দাবীদার তাদেরকে অবশ্যই সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে নিজের পরিবার-পরিজনকে ইসলামী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলামী আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

দারস : ১১

৪১. সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫৪, রুকূ-৬

আলোচ্য : ৩০-৩৬ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٣٠) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ - (٣١) نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج
وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ - (٣٢) نُزُلاً
مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ - (٣٣) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (٣٤) وَلاَتَسْتَوِى
الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ
وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - (٣٥) وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلاَّ الَّذِيْنَ
صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ - (٣٦) وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে) (৩০) "যারা ঘোষণা দিয়েছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর দৃঢ়ভাবে স্থির থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয় এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তি হয়ো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। (৩১) আমরা এ দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে আর যে জিনিসের

ফরমায়েশ করবে তাই লাভ করবে। (৩২) এটা মেহমানদারি ক্ষমাশীল ও দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে। (৩৩) সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা দিল, আমি মুসলমান। (৩৪) উত্তম কাজ ও মন্দ কাজ সমান নয়। মন্দ প্রতিহত করো সবচেয়ে উত্তম দ্বারা। তাহলে দেখবে, যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। (৩৫) ধৈর্যশীল ব্যতীত এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না এবং অতি ভাগ্যবান ব্যতীত এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না। (৩৬) যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা আঁচ করতে পার তাহলে আল্লাহর আশ্রয় কামনা কর। তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।"

শব্দার্থ : اِسْتَقَامُوْا - তারা অটল থাকে, تَتَنَزَّلُ - নাযিল হয়, مَلٰئِكَةُ - ফেরেশতা, اَلاَّ تَخَافُوْا - তোমরা ভয় করো না, لاَتَحْزَنُوْا - তোমরা চিন্তিত হয়ো না, اَبْشِرُوْا - তোমরা সুসংবাদ শুনে খুশী হও, تُوْعَدُوْنَ - ওয়াদা করা হয়েছিল, اَوْلِيٰؤُكُمْ - তোমাদের বন্ধু, تَشْتَهِىْ - ইচ্ছা পোষণ করবে, تَدَّعُوْنَ - তোমরা দাবী করবে, نُزُلاً - আপ্যায়ন, اَحْسَنُ - উত্তম, دَعَا - ডাকে, صَالِحًا - নেকীর, مُسْلِمِيْنَ - আত্মসমর্পণকারী, لاَ تَسْتَوِىْ - সমান হয় না, حَسَنَةُ - উত্তম, ভাল, سَيِّئَةُ - মন্দ, اِدْفَعْ - প্রতিহত কর, عَدَاوَةٌ - শত্রুতা, وَلِىٌّ - বন্ধু, حَمِيْمٌ - অন্তরংগ, يُلَقّٰهَا - তা লাভ করে, صَبَرُوْا - ধৈর্যশীল, ذُوْحَظٍّ - ভাগ্যবান, عَظِيْمٌ - মহান, বড়, يَنْزَغَنَّكَ - তোমাকে প্ররোচনা দেয়, فَاسْتَعِذْ - তবে আশ্রয় চাও, سَمِيْعٌ - সবকিছু শুনেন, عَلِيْمٌ - সবকিছু জানেন।

নামকরণ : দু'টি শব্দযোগে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। একটি حم ও অপরটি السجدة। অর্থাৎ حم (হা-মীম) শব্দ দিয়ে এ সূরা শুরু হয়েছে এবং এ সূরার কোন এক স্থানে সিজদার আয়াত আছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত অনুসারে এ সূরা

নাযিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে, হযরত হামযা (রা)-র ঈমান আনার পর এবং হযরত উমর (রা)-এর ঈমান আনার পূর্বে। নবী (সা)-এর প্রাচীনতম জীবনীকার মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবনে কা'ব আল-কুরাযীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, একদা কুরাইশ নেতারা মসজিদে হারামে একত্র হয়ে আসর জমিয়ে বসেছিল এবং মসজিদের অন্য এক কোণে রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন হযরত হামযা (রা) ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। কুরাইশরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাংগঠনিক উন্নতি দেখে অস্থির হয়ে উঠছিল। এ সময় উতবা ইবনে রাবিয়া (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশ নেতাদের বললেন : ভাইসব! আপনারা যদি মত দেন তাহলে আমি মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে আলাপ করে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। সে যদি কোন একটি প্রস্তাব মেনে নেয় তবে আমাদের নিকটও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর এভাবে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। উপস্থিত সবাই তার সাথে একমত হলো। উতবা উঠে নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে বসলো। নবী (সা) তার দিকে ফিরে বসলে সে বললো, ভাজিতা! বংশ ও গোত্রের বিচারে তোমার কওমের মধ্যে তোমার যে মর্যাদা তা তুমি অবগত আছ। কিন্তু তুমি তোমার কওমকে এক মসিবতের মধ্যে ফেলেছ। তুমি কওমের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছ। গোটা কওমকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছ। কওমের ধর্ম ও তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করছ এবং এমন কথা বলতে শুরু করেছ যে আমাদের বাপ-দাদারা নাকি কাফের ছিল। এখন আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি তোমার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি, তা তুমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। হয়তো তার কোনটি তুমি গ্রহণ করতে পার কিনা?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবুল ওয়ালিদ, আপনি বলুন, আমি শুনবো।

সে বললো : ১। ভাতিজা! তুমি যে কাজ শুরু করেছ তা দিয়ে সম্পদ অর্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এতো সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে সম্পদশালী হয়ে যাবে।

২। তুমি যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে ব্যতীত কোন বিষয়ে ফায়সালা করবো না।

৩। যদি তুমি বাদশাহী চাও তাহলে আমরা তোমাকে বাদশা বানিয়ে দেবো।

৪। আর যদি তোমাকে কোন জিনে আছর করে থাকে তাহলে আমরা ভাল ভাল চিকিৎসক ডেকে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

৫। যদি তোমার কোন সুন্দরী নারীর প্রয়োজন মনে কর তাহলে আমরা তোমাকে দেশের সেরা সুন্দরী জোগাড় করে দেবো।

উতবা বলছিল আর নবী করীম (সা) চুপচাপ তার কথা শুনছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন : তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। এরপর তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়ে এই সূরা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। উতবা তার দুই হাত পেছনের দিকে মাটিতে হেলান দিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলো। সিজদার ৩৮ নং আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি সিজদা করলেন এবং মাথা তুলে বললেন : "হে আবুল ওয়ালীদ! আমার জবাবও আপনি পেয়ে গেলেন। এখন যা ইচ্ছা করুন।"

উতবা উঠে কুরাইশ নেতাদের আসরের দিকে অগ্রসর হলে লোকজন দূর থেকে তাকে দেখেই বললো, আল্লাহর শপথ! উতবার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল এটা সেই চেহারা নয়। সে এসে বসলে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, কি শুনে এলে? সে বলোল, "আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা এর আগে কখনও শুনিনি। আল্লাহর কসম! এটা না কবিতা, না যাদু, না গণনা বিদ্যা। হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ! আমার কথা শোন এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস এ বাণী সফল হবেই। মনে কর যদি আরবের লোকেরা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তাহলে নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং অন্যরাই তাকে পরাভূত করবে। আর সে যদি

আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা হবে।" তার কথা শুনামাত্র কুরাইশ নেতারা বলে উঠলো, ওয়ালীদের বাপ! শেষ পর্যন্ত তোমার উপর তার যাদুর প্রভাব পড়লো? উতবা বললো, "আমি আমার মত তোমাদের সামনে পেশ করলাম। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো।"

কোন কোন তাফসীরকারের বর্ণনায় একথাও আছে যে, নবী (সা) তিলাওয়াত করতে করতে فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ـ (এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে আদ ও ছামূদ জাতির আযাবের মত অকস্মাৎ আগমনকারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি)। আয়াতে পৌঁছলে উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের উপর হাত চেপে ধরে বললো, "আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের কওমের প্রতি সদয় হও।" পরে সে কুরাইশ নেতাদের নিকট তার এ কাজের কারণ বর্ণনা করেছে এই বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মদের (সা) মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের উপর আযাব নাযিল না হয় এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : উতবার এ কথার জওয়াবে আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে যে কালামে পাকের ভাষণ নাযিল হয়, তাতে উতবার কথাগুলোর প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি, বরং কাফেরদের মূল বিরোধিতাকেই আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কাফেররা কুরআন মজীদের দাওয়াতকে প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য অত্যন্ত হঠকারিতা ও অনৈতিকতা সহকারে চেষ্টা করছিল। তারা নবী করীম (সা)-কে বলছিল, আপনি যাই করুন না কেন আমরা আপনার কোন কথাই শুনব না। আমরা আমাদের দিলের উপর পর্দা, কানে তালা ও আমাদের ও আপনার মাঝে একটা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, তা উভয়কে একত্র হতে দেবে না।

তারা পরিষ্কার ভাষায় নবী করীম (সা)কে জানিয়ে দিয়ে ছিল যে, আপনি আপনার দাওয়াতী কাজ করে যান, আমরা যথাসাধ্য আপনার বিরোধিতা করে যাব। তারা নবী করীম (সা)-কে প্রতিরোধ করার জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরী করে ফেললো। নবী করীম (সা) ও তাঁর পক্ষের কোন লোক সাধারণ মানুষকে কুরআন মজীদ পড়ে শুনাতে চেষ্টা করলে তারা আকস্মিকভাবে এত উচ্চকণ্ঠে হাঙ্গামা ও চিৎকার করতো যে কানে তালা লেগে যেতো। কুরআনের আয়াতসমূহের উল্টো অর্থ করে জনগণের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করতো। কুরআনের আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে, কিছু অংশ বাদ দিয়ে তদস্থলে নিজেদের মনগড়া কিছু অংশ ঢুকিয়ে দিয়ে একটা নূতন কথা দাঁড় করাতো, যেন কুরআন ও রাসূল সম্পর্কে লোকদের ধারণা খারাপ হয়।

আশ্চর্য ধরনের সব প্রশ্ন ও আপত্তি করতো তারা। তার একটা নমুনা এ সূরায় পেশ করা হয়েছে। একজন আরব যদি আরবী ভাষায় কোন কালাম শুনায়, তবে তাতে মুজিযার কি আছে? আরবী তো তার মাতৃভাষা, মাতৃভাষায় যার ইচ্ছা সেই কোন না কোন কালাম রচনা করতে পারে, তা আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে বলে দাবী করার কি আছে? তবে তিনি যে ভাষা জানেন না সেই ভাষায় উচ্চ মানের কোন কালাম যদি সহসা শুনাতে পারতেন তবে না হয় বুঝা যেতো, এটা তাঁর নিজস্ব রচিত নয়, এটা উপর হতে নাযিল হয়েছে। এ অন্ধ বিরোধিতার জবাবে যা কিছু বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো এই :

১। মহান আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন আরবী ভাষায়ই নাযিল হয়েছে। এতে স্পষ্ট ভাষায় যে তত্ত্বকথা প্রকাশ করা হয়েছে মূর্খ লোকেরা তাতে কোন জ্ঞানের সন্ধান পায়নি বটে; কিন্তু সমঝদার লোকেরা তা হতে জ্ঞানের আলোর সাথে ফায়দাও পেতে পারেন। আর যারা তা হতে বিমুখ হয়, তাদের পরিণাম সম্পর্কে তাদের ভয় করা উচিত। তোমাদের হিদায়াতের জন্য এ কুরআন যদি কোন অনারব ভাষায় নাযিল করা হতো তাহলে তোমরাই তখন বলতে, আরববাসীদের হিদায়াতের জন্য অনারব ভাষায়

কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা কেউ বুঝে না। আসলে তোমরা হিদায়াত পেতেই চাও না। তা না মানার জন্য নিত্য নূতন বাহানা তালাশ করছো।

তোমরা নিজেদের চোখ কান যতই বন্ধ করে রাখ না কেন, নিজেদের দিলের উপর যত পর্দাই লাগাও না কেন, আসল সত্য কথা এই যে, তোমাদের আল্লাহ আর আমাদের আল্লাহ একই আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর কারও বান্দা নও। তোমরা জিদ করলেই এ সত্য বদলে যাবে না। তোমরা যদি ইলম ও আমল ঠিক করে নাও, তবে তাতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি নাই মানো তবে নিজেরাই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।

তোমরা এ শিরক ও কুফরী কার সঙ্গে করছ, সে বিষয়ে কোন অনুভূতি আছে কি? সেই আল্লাহর সাথে যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মৃত যমীন থেকে ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করছেন। তাঁরই নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে তাঁর সাথে শরীক করছ। তোমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করা হলে জিদের বশবর্তী হলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। তোমরা যদি হিদায়াতের মধ্যে না আস তবে জেনে রেখো, তোমাদের উপর তেমনি আযাব সহসাই ভেঙ্গে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে যেমন আদ ও ছামূদ জাতির উপর ভেঙ্গে পড়েছিল। আর সে আযাবও তোমাদের অপরাধের শেষ শাস্তি নয়, পরে হাশরের ময়দানে তোমাদের হিসাব নেয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুন তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে।

তোমরা কি কখনও চিন্তা করে দেখেছ, কুরআন যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে তাহলে তা অমান্য করে এমনভাবে তার বিরোধিতা করলে তোমাদের পরিণতি কতখানি মর্মান্তিক হবে?

সেদিন খুব বেশী দূরে নয় যখন নিজেদের চোখেই তোমরা দেখতে পাবে যে, এ কুরআনের দাওয়াত দিগ-দিগন্তে প্রভাবশালী হয়ে উঠছে, আর তোমরা তার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছ। একথা প্রচার হওয়ার পর প্রচণ্ড বিরোধিতার পরিবেশে ঈমানদারগণ ও স্বয়ং নবী করীম (সা) যে পরিস্থিতি

ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করা হয়েছে। দ্বীনের তাবলীগ করা তো দূরের কথা, তখন ঈমানের পথে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। দুশমনদের ভয়াবহ ঐক্যজোট ও চারদিকে সমাচ্ছন্ন শক্তির মুকাবিলায় তারা নিজেদেরকে নিতান্ত অসহায় ও বন্ধু-বান্ধবহীন মনে করছিলেন। এ অবস্থায় প্রথমত তাদেরকে একথা বলে সাহস দেয়া হয়েছে যে, আসলে তোমরা অসহায় ও বন্ধু-বান্ধবহীন নও। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে একবার নিজের রব মেনে এ আকীদায় অটল ও মযবুত হয়ে থাকে, তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা নাযিল হয় এবং দুনিয়া হতে পারলোক পর্যন্ত তাকে সাহচর্য দান করে। পরে তাদের মনে অভয় দান করা হয়েছে একথা বলে যে, যারা নেক আমল করে, অন্য লোককে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং শক্ত হয়ে বলে, আমরা "মুসলমান," প্রকৃতপক্ষে তারাই উত্তম মানুষ।

নবী করীম (সা)-এর সন্মুখে একটি প্রশ্ন কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করছিল। প্রশ্নটা হলো, দ্বীনের এ দাওয়াতের পথে যখন এ কঠিন দুর্লংঘ্য পাহাড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে রয়েছে তখন এর মধ্য হতে ইসলাম প্রচারের পথ উন্মুক্ত হবে কেমন করে? জওয়াবে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব প্রদর্শনীমূলক প্রতিবন্ধকতার পাহাড় বাহ্যত খুবই কঠিন ও দুর্লংঘ্য মনে হয় বটে, কিন্তু উত্তম উন্নত মানের চরিত্রই হলো এমন হাতিয়ার যা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। অতীব ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাও এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।

ব্যাখ্যা : (ক) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ... كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۔ : কাফেরদের ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার পর এখন ঈমানদার ও নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হচ্ছে। যারা আল্লাহকে রব বলে ঘোষণা করার পর অন্য কোন আকীদা গ্রহণ করেননি এবং নিজেদের কর্মজীবনে তাওহীদের আকীদার দাবীসমূহও পূরণ করেছেন। তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকার অর্থ কি নবী (সা) ও প্রধান সাহাবাগণ তার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন : "বহু মানুষ আল্লাহকে তার রব বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আবার কাফের হয়ে গিয়েছে। দৃঢ়পদ সেই ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই আকীদা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।" (ইবনে জারীর, নাসাঈ, ইবনে আবু হাতেম)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

لم يشركوا بالله ولم يلتفتوا الى اله غيره -

"এরপর আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেননি, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্যের প্রতি আকৃষ্টও হননি।" (ইবনে জারীর)

একবার হযরত উমর (রা) মিম্বরে উঠে এ আয়াত পাঠ করে বললেন : "আল্লাহর শপথ! নিজ আকীদায় দৃঢ় ও স্থির তারাই যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, শিয়ালের মত এদিক থেকে সেদিকে এবং সেদিক থেকে এদিকে ছুটে বেড়ায়নি।" (ইবনে জারীর)

হযরত উছমান (রা) বলেন : "নিজের আমলকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।" (কাশশাফ)

হযরত আলী (রা) বলেন : "আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করা ফরযসমূহ আনুগত্যের সাথে আদায় করেছে।" (কাশশাফ)

যে পরিস্থিতিতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে এই পৃথিবীতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমুন্নত করার জন্য যারা জীবনপাত করছে তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতরণের কথা বর্ণনা করাই যে এখানে মূল উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। যাতে তারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে, মনোবল ফিরে পায় এবং এই অনুভূতিতে তাদের হৃদয়মন পরিতৃপ্ত হয় যে, তারা সহযোগী ও বন্ধুহীন নয়, বরং আল্লাহর ফেরেশতা তাদের সাথে আছে। মৃত্যুর সময়ও ফেরেশতারা ঈমানদারদের স্বাগত জানাতে আসে, কবরেও তারা তাদের স্বাগত জানায় এবং যেদিন কিয়ামত হবে সেদিনও হাশরের শুরু থেকে জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত সব সময় তারা তাদের সাথে থাকবে। তাদের এই সাহচর্য সেই

জগতের জন্য নির্দিষ্ট নয়, এ পৃথিবীতেও চলছে। কথার ধারাবাহিকতা বলছে হক ও বাতিলের সংঘাতে বাতিলের অনুসারীদের সাথে যেমন শয়তান ও অপরাধীরা থাকে, তেমনি ঈমানদারদের সাথে ফেরেশতারা থাকে। শয়তান বাতিলপন্থীদের কতৃকর্মসমূহকে তাদের সঙ্গী-সাথীদের সুদৃশ্য করে দেখায় এবং তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয় যে, হককে হেয় করার জন্য তোমরা যে যুলুম-অত্যাচার ও বেঈমানী করছো সেটিই তোমাদের সফলতার উপায় এবং এভাবে পৃথিবীতে তোমাদের নেতৃত্ব নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। আর হকপন্থীদের কাছে আল্লাহর ফেরেশতারা এসে যে সুখবরটি পেশ করে তা পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হচ্ছে :

(খ)-نَحْنُ اَوْلِيٰؤُكُمْ ... غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ : এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক কথা বা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত ঈমানদারদের জন্য প্রশান্তির একটি নতুন বিষয় বহন করে। পৃথিবীতে ফেরেশতাদের এই উপদেশের অর্থ হচ্ছে, বাতিলের শক্তি যতই পরাক্রান্ত হোক না কেন তাদের দেখে কখনো ভীত হয়ো না এবং হকের অনুসারী হওয়ার কারণে যত দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনাই সহইতে হোক সেজন্য দুঃখ করবে না। কেননা ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য এমন কিছু আছে যার কাছে দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তুচ্ছ। মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা যখন এই কথাগুলো বলে তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, তুমি সামনে যে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছো সেখানে তোমার জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই। সেখানে জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষমান। আর দুনিয়াতে যা কিছু তুমি ছেড়ে যাচ্ছ সেজন্য তোমার দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা এখানে আমি তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু। আলমে বারযাখ ও হাশরের ময়দানে যখন ফেরেশতারা একথাগুলো বলবে তখন তার অর্থ হবে, এখানে তোমাদের জন্য কেবল শান্তি আর শান্তি। পার্থিব জীবনে তোমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ, সেজন্য দুঃখ করো না এবং আখেরাতে যা কিছু সামনে আসবে সেজন্য ভয় পাবে না। কারণ আমরা তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি আগেই তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

(গ) - وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً ... مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - "সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো, আমি মুসলিম!"

তোমরা নিজেরা নেক কাজ কর, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাক এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজেদের জন্য বিপদজনক এবং দুঃখ-মুসিবতকে আহ্বান জানানোর শামিল, এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করো, আমি মুসলমান। মানুষের এর চেয়ে উচ্চতর ঘোষণা আর কিছু নেই। এ কথার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্য যে পরিস্থিতিতে তা বলা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সে সময় অবস্থা এই ছিল যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো সে হঠাৎ করেই অনুভব করতো যেন হিংস্র শ্বাপদ ভরা জংগলে পা দিয়েছে, যেখানে সবাই তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য ছুটে আসছে। যে ব্যক্তি আরও একটু অগ্রসর হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য মুখ খুলছে, সে যেন তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য হিংস্র পশুকুলকে আহ্বান জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করে সোজা পথ গ্রহণ করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া নিঃসন্দেহে দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ।

নিজে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয়া, সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানানো এবং কেউ যেন ইসলাম ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এরূপ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার ঈমানদারি।

(ঘ) - وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ... وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - হে নবী, সৎ কাজ আর অসৎ কাজ সমান হতে পারে না। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা আবৃত কর যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।

তখন অবস্থা ছিল এই যে, চরম হঠকারিতা এবং আক্রমণাত্মক বিরোধিতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের মুকাবিলা করা হচ্ছিল। নৈতিকতা, মানবতা

ও ভদ্রতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছিল। নবী (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে সব রকমের মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছিল। তাঁর বদনাম করা এবং তাঁর সম্পর্কে লোকদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য সব রকমের দুষ্টবুদ্ধি ও কূটকৌশল কাজে লাগানো হচ্ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিল এবং শত্রুতামূলক প্ররোচনার জন্য পুরো একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। তাঁকে, তাঁর সঙ্গীদেরকে সর্বপ্রকারে কষ্ট দেয়া হচ্ছিল। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁর ইসলাম প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক হৈ চৈ ও হট্টগোল করার জন্য একদল লোককে সবসময় তৈরী রাখা হতো। যখনই তিনি ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য কথা বলতে শুরু করতেন তখনই তারা শোরগোল করতো কেউ তাঁর কথা শুনতে না পায়। এটা এমন একটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতি ছিল যে, বাহিক্যভাবে আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ বলে মনে হচ্ছিল। বিরোধিতা নস্যাৎ করার জন্য সেই সময় নবী (সা)-কে পন্থা বলে দেয়া হয়েছিল।

প্রথমে বলা হয়েছে, সৎ কর্ম ও দুষ্কর্ম সমান নয়। তোমাদের বিরোধীরা যত ভয়ানক তুফানই সৃষ্টি করুক না কেন এবং তার মুকাবিলায় নেকীকে যত অক্ষম ও অসহায়ই মনে হোক না কেন দুষ্কর্মের নিজের মধ্যেই এমন দুর্বলতা আছে যা শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ করে দেয়। কারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব প্রকৃতি দুষ্কর্মকে ঘৃণা না করে পারে না। দুষ্কর্মের সহযোগীই শুধু নয়, তার ধ্বজাধারী পর্যন্ত মনে মনে জানে. সে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী এবং সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠকারিতা করছে। এ জিনিসটি অন্যদের মনে তার প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, নিজের কাছেই তাকে খাটো করে দেয়। এভাবে তার নিজের মনের মধ্যেই এক চোর জন্ম নেয়। শত্রুতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এ চোর ভিতর থেকেই তার সংকল্প ও মনোবলের উপর সংগোপনে হানা দিতে থাকে। এই দুষ্কর্মের মুকাবিলায় যে সৎকর্মকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় বলে মনে হয়, তার প্রচারের তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকলে শেষ পর্যন্ত সেই

বিজয়ী হবে। কারণ প্রথমত সৎকর্ম নিজেই একটি শক্তি যা হৃদয়-মনকে জয় করে এবং ব্যক্তি যতই শত্রুতাভাবাপন্ন হোক না কেন সে নিজের মনে তার জন্য সম্মানবোধ না করে পারে না। তাছাড়া নেকী ও দুষ্কর্ম যখন সামনাসামনি সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং উভয়ের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি উন্মোচিত হয় এমন পরিস্থিতিতে কিছুকাল সংঘাতে লিপ্ত থাকার পর খুব কম লোকই এমন থাকতে পারে যারা দুষ্কর্ম ঘৃণা করবে না এবং সৎ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

দ্বিতীয়ত, দুষ্কর্মের মুকাবিলায় শুধু মাত্র সৎকর্ম দিয়ে নয়, অনেক উচ্চ মানের সৎকর্ম দিয়ে মুকাবিলা কর। অর্থাৎ কেউ যদি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে আর তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে শুধু সৎ কর্ম হলো। উন্নত পর্যায়ের সৎকর্ম হচ্ছে, যে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করবে সুযোগ পেলে তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, তার উপকার কর।

এর সুফল এই যে, জঘন্যতম শত্রুও এভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে। কারণ এটিই মানুষের প্রকৃতি। আপনি যদি গালির জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে একটি নেকী বা সৎ কর্ম। অবশ্য তা গালিদাতার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু গালির জবাবে আপনি যদি তার কল্যাণ কামনা করেন তাহলে চরম নির্লজ্জ শত্রুও লজ্জিত হবে এবং আর কখনও আপনার বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলার জন্য মুখ খোলা তার পক্ষে কঠিন হবে। একজন লোক আপনার ক্ষতি করার কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দেয় না। আপনি যদি তার অত্যাচার বরদাশত করে যেতে থাকেন তাহলে সে হয়তো তার দুষ্কর্মের ব্যাপারে আরও সাহসী হয়ে উঠবে। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেখে যদি আপনি তাকে রক্ষা করেন তাহলে সে আপনার একান্ত অনুগত হয়ে যাবে। কারণ ঐ সুকৃতির মুকাবিলায় কোন দুষ্কৃতিই টিকে থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই সাধারণ নিয়মকে এ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, উন্নত পর্যায়ের সৎকর্মের মাধ্যমে সব রকমের শত্রু অনিবার্যরূপে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন জঘন্য মনের মানুষও আছে যে তার অত্যাচার ক্ষমা করা ও দুষ্কৃতির জবাব

অনুকম্পা ও সুকৃতির মাধ্যমে দেয়ার ব্যাপারে আপনি যতই তৎপর হোন না কেন তার বিচ্ছুর ন্যায় বিষাক্ত হুলের দংশনে কখনো ভাটা পড়বে না। তবে এ ধরনের খারাপ মানুষ ততটাই বিরল যতটা বিরল উন্নত পর্যায়ের ভাল মানুষ।

(ঙ) وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ... ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ - ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।

এটা অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা হলেও এজন্য দরকার দৃঢ়সংকল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। এটা কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষেই এসব গুণের বাহক হওয়া সম্ভব যে বুঝেশুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছে, যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকী ও সততা এমন গভীরভাবে শিকড় গেঁড়ে বসেছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম ও নোংরামী তাকে তার উচ্চাসন থেকে নীচে নামিয়ে আনতে সক্ষম নয়।

এটা প্রকৃতির বিধান। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষই কেবল এই গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এই গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনজিলে মকসুদে পৌঁছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। কেউ নীচ আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

(চ) وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ ... هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা আঁচ করতে পার তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

শয়তান যখন দেখে, হক ও বাতিলের লড়াইয়ে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দ্বারা হীনতার এবং সুকৃতি দ্বারা দুষ্কৃতির মুকাবিলা করা হচ্ছে, তখন সে চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। সে চায় কোনভাবে একবারের জন্য হলেও হকের পক্ষে সংগ্রামকারী, বিশেষ করে তাদের বিশিষ্ট লোকজন ও তাদের নেতৃবৃন্দের দ্বারা এমন কোন ত্রুটি সংঘটিত করিয়ে দেয়া যায় কিনা যাতে

সাধারণ মানুষকে বলা যায়, দেখুন খারাপ কাজ এক তরফা হচ্ছে না। একপক্ষ থেকে নীচ ও জঘন্য কাজ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু অপর পক্ষের লোকেরাও খুব একটা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ নয়, তারাও তো অমুক হীন আচরণ করেছে। এক পক্ষের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি এবং অপর পক্ষের জবাবী তৎপরতার মধ্যে ইনসাফের সাথে তুলনামূলক বিচারের যোগ্যতা সাধারণ মানুষের থাকে না।

যতক্ষণ তারা দেখে বিরোধীরা সব রকমের জঘন্য আচরণ করছে, কিন্তু এই লোকগুলো ভদ্রতা ও শিষ্টাচার এবং মর্যাদা, নেকী ও সত্যবাদিতার পথ থেকে বিন্দুমাত্রও দূরে সরে যাচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর তার গভীর প্রভাব পড়তে থাকে। কিন্তু যদি কোথাও তাদের পক্ষ থেকে কোন অযৌক্তিক বা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী আচরণ হয়ে যায়, তা কোন বড় যুলুমের প্রতিবাদে হলেও তাদের দৃষ্টিতে তারা উভয়েই সমান হয়ে যায় এবং বিরোধীরাও একটি শক্ত কথার জবাব হঠকারিতার সাহায্যে দেয়ার অজুহাত পেয়ে যায়। এ করণে বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাকো। সে অত্যন্ত দরদী ও মঙ্গলকামী সেজে এই বলে তোমাদেরকে উত্তেজিত করবে যে, অমুক অত্যাচার কখনো বরদাশত করা উচিত নয়, অমুক কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া উচিত এবং এই আক্রমণের জবাবে লড়াই করা উচিত। অন্যথা তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করা হবে এবং তোমাদের আদৌ কোন প্রভাব থাকবে না।

এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে কোন অযথা উত্তেজনা অনুভব করবে তখন সাবধান হয়ে যাও। কারণ তা শয়তানের প্ররোচনা। সে তোমাদের উত্তেজিত করে কোন ভুল সংঘটিত করাতে চায়। সাবধান হয়ে যাওয়ার পর মনে করো না, আমি আমার মেজাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছি, শয়তান আমাকে দিয়ে কোন ত্রুটি করাতে পারবে না। নিজের এই মনে করাটা হবে শয়তানের আরেকটি বেশী ভয়ংকর হাতিয়ার। এর চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তিনি যদি তাওফীক দান করেন ও রক্ষা করেন তবেই মানুষ ভুলত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ইমাম আহমাদ (রা) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে যে ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন সেটি এ বিষয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সামনে একদা এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে অকথ্য গালিগালাজ করতে লাগলো। হযরত আবু বকর (রা) চুপচাপ তার গালি শুনতে থাকলেন আর তাঁর দিকে চেয়ে নবী (সা) মুচকি হাসতে থাকলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা) ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং জবাবে তিনিও তাকে একটা কঠোর কথা বলে ফেললেন। তার মুখ থেকে সে কথাটি বের হওয়া মাত্র নবী (সা)-এর উপর চরম বিরক্তি ভাব ছেয়ে গেল এবং ক্রমে তা তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠতে লাগলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন। হযরত আবু বকরও উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন এবং পথিমধ্যে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিল তখন আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখনই আমি তাকে জবাব দিলাম তখনই আপনি অসন্তুষ্ট হলেন? নবী (সা) বললেন : আপনি যতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আপনার সাথে থেকে আপনার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিল। যখন আপনি জবাব দিলেন তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। শয়তান যেখানে আছে আমি তো সেখানে থাকতে পারি না।

বিরোধিতার তুফানের মুখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে জিনিসটি মুমিনের হৃদয়ে ধৈর্য, গভীর প্রশান্তি ও পরম তৃপ্তির সৃষ্টি করে তাতে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার মাথা নত হয়ে আসবে। আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের সব কথাই তিনি শুনছেন এবং উভয়ের কর্মনীতি যা কিছুই হোক না কেন তা তিনি দেখছেন। এই অবস্থার কারণেই মুমিন বান্দা নিজের ব্যাপারটি এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

কুরআন মজীদে এই পঞ্চমবার নবী (সা)-কে ও তাঁর মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে দীন ইসলামের দাওয়াত এবং সমাজ সংস্কারের এ কৌশল শেখানো হয়েছে। এর পূর্বে আরও চার বার চার স্থানে এ কৌশল শেখানো হয়েছে। সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ :

১১০-১১১ আয়াত, সূরা আন-নাহল : ১২৫-১২৭ আয়াত, সূরা আল-মুমিনূন : ৯৬ আয়াত ও সূরা আনকাবূত : ৪৮ আয়াত।

শিক্ষা : ১। আমরা আল্লাহকে আমাদের রব বলে ঘোষণা দেবো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি রহমতের ফেরেশতা নেমে এসে আমাদেরকে অভয় দান করবে এবং বেহেশতের সুসংবাদ দেবে। সেই ফেরেশতা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে প্রত্যেক কাজে আমাদেরকে সহায়তা দেবে।

২। আমরা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবো, সৎ কাজ করবো এবং নিজকে আত্মসমর্পণকারী হিসেবে ঘোষণা দেবো।

৩। সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। সৎ কাজ দ্বারা অসৎ কাজের মুকাবিলা করবো, তাহলে প্রাণের দুশমনও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।

৪। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ঈমানদারগণ নিজেদের মধ্যে শয়তানের প্ররোচনা টের পেলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।

বাস্তবায়ন : আমরা যারা আল্লাহকে রব বলে স্বীকৃতি দেয়ার পর অবিচল থেকে রহমতের ফেরেশতার সহায়তা নিয়ে আল্লাহ ঘোষিত সর্বোত্তম কথা– আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান ও সৎ কাজ করবো এবং নিজেদেরকে আত্মসমর্পণকারী হিসেবে ঘোষণা দেবো। অসৎ কাজকে সৎ কাজ দ্বারা সংশোধনের চেষ্টা করতে গিয়ে শয়তানের প্ররোচনা টের পেলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবো। এভাবে আল্লাহর দ্বীনের সর্বোত্তম বৈশিষ্টগুলোর সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিফলন ঘটিয়ে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ১২

হিকমতের সাথে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিন

১৬. সূরা আন-নাহ্ল

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১২৮, রুকূ-১৬

আলোচ্য : ১২৫-১২৮ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٢٥) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ (١٢٦) وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ـ (١٢٧) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ـ (١٢٨) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে) (১২৫) হে নবী! প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও। লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রব অধিক ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং কে আছে সঠিক পথে। (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুক তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর কর তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম। হে নবী! সবর অবলম্বন করো– আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সাহায্যে তুমি এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

(১২৮) আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"

শব্দার্থ : اُدْعُ - তুমি আহ্বান কর, سَبِيْلِ - পথের, اَلْمَوْعِظَةِ - উপদেশ, اَلْحَسَنَةِ - উত্তম, جَادِلْهُمْ - তাদের যুক্তি দাও, بِالَّتِىْ - এমন উপায়ে, هِىَ - যা, اَحْسَنَ - অতি উত্তম, اَعْلَمُ - খুব জানেন, بِمَنْ- সম্বন্ধে যে, ضَلَّ - ভ্রষ্ট হয়েছে, سَبِيْلِهٖ - তাঁর পথ, اَعْلَمُ - খুব জানেন, بِالْمُهْتَدِيْنَ - হিদায়াতপ্রাপ্তদেরকে, عَاقَبْتُمْ - তোমরা প্রতিশোধ নাও, فَعَاقِبُوْا - তবে তোমরা প্রতিশোধ নেবে, بِمِثْلِ - সমান, عُوْقِبْتُمْ - তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে, لَئِنْ - অবশ্যই যদি, صَبَرْتُمْ - তোমরা সবর কর, لَهُوَ - অবশ্যই তা, خَيْرٌ - উত্তম, لِلصّٰبِرِيْنَ - সবরকারীদের জন্য, وَاصْبِرْ - আর সবর কর, صَبْرُكَ - তোমার ধৈর্য, تَحْزَنْ - দুঃখ কর, تَكُ - তুমি, ضَيْقٍ - সংকীর্ণতার, مِمَّا - তা থেকে যা, يَمْكُرُوْنَ - তারা ষড়যন্ত্র করে, اِتَّقَوْا - তাকওয়া অবলম্বন করে, مُحْسِنُوْنَ - ইহসানকারী।

নামকরণ : ৬৮ নং আয়াতের وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ - বাক্যাংশ থেকে এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এও নিছক আলামত ভিত্তিক, নয়তো النحل বা মৌমাছি এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : সূরার আভ্যন্তরীণ বহু সংখ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণের দৃষ্টিতে এ সূরার নাযিল হবার সময়কাল সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। যেমন ৪১ নং আয়াতের অংশ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ بَعْدَ مَا ظُلِمُوْا "যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে" থেকে স্পষ্ট জানা যায়, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় হাবশার হিজরত সম্পন্ন হয়েছিল।

১০৬ নং আয়াত مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ "ঈমান আনার পর যে লোক আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে" হতে জানা যায়, এ সময় মুসলমানদের উপর অমানবিক অত্যাচার ও যুলুম পূর্ণ তীব্রতা সহকারে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল

এবং প্রশ্ন জেগেছিল যে, কোন ব্যক্তি যদি অসহ্য নির্যাতন-উৎপীড়নে বাধ্য হয়ে কুফরীর কলেমা মুখে উচ্চারণ করে বসে, তাহলে তার হুকুম কি হবে? ১১২-১১৪ নং আয়াত وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً থেকে اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ হতে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, নবী (সা)-এর নবুয়াত লাভের পর মক্কায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় তার অবসান হয়ে গিয়েছিল। এ সূরার ১১৫ নং আয়াতটি এমন যে, সূরা আনআম-এর ১১৯ নং আয়াতে তার হাওয়ালা দেয়া হয়েছে। আর ১১৮ নং আয়াতটি এমন যে, তাতে সূরা আন'আম-এর ১৪৬ নং আয়াতের কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ দু'টি সূরা প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে স্পষ্ট জানা যায়, এ সূরা রাসূলে করীম (সা)-এর মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। সূরার সাধারণ বর্ণনাভঙ্গী থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করা, শিরক উচ্ছেদ করা, নবীর আহ্বানে সাড়া না দেয়ার অশুভ পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা এ সূরার মূল বিষয়বস্তু, বা আলোচ্য বিষয়।

কোন ভূমিকা ছাড়াই হঠাৎ একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে এ সূরার সূচনা করা হয়েছে। নবী (সা)-এর শত্রুরা বলতো, আমরা তোমার বিরোধিতা করছি, তখন তুমি আমাদের আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, সেই আযাব আসছে না কেন? সত্যি তুমি যদি নবী হতে তবে আল্লাহর আযাব আসতো এবং তোমার কথা সঠিক প্রমাণিত হতো। আল্লাহর আযাব না আসাটাই তোমার নবী না হওয়ার প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, নির্বোধের দল, আল্লাহর আযাব তো তোমাদের মাথার উপর একেবারে তৈরী হয়ে আছে। তা বিলম্বে আসার জন্য তোমরা হৈ চৈ করো না, বরং তোমরা যে সামান্য সময় পাচ্ছ তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এর সাথে সাথেই তাদেরকে বুঝাবার জন্য ভাষণ শুরু হয়েছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু একের পর এক সামনে আসতে শুরু করেছে।

(১) হৃদয়গ্রাহী যুক্তি এবং জগৎ ও জীবনের নিদর্শনসমূহের সুস্পষ্ট সাক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিথ্যা এবং তাওহীদই পরম সত্য।

(২) অস্বীকারকারীদের সন্দেহ-সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার প্রতিটির জবাব দেয়া হয়েছে।

(৩) অযৌক্তিকভাবে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোঁয়ার্তুমি এবং সত্যের মুকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছে।

(৪) ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনে যেসব নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেগুলো সংক্ষেপে কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তারা যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেবার দাবী করে থাকে এটা নিছক বাহ্যিক ও অন্তসারশূন্য দাবী নয়, বরং এর বেশ কিছু চাহিদাও রয়েছে। তাদের আকীদা, বিশ্বাস, নৈতিক, চারিত্রিক ও বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রকাশ হওয়া উচিত।

(৫) নবী করীম (সা) ও তাঁর সাথীদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের বিরোধিতা, প্রতিরোধ সৃষ্টি ও যুলুম নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি কি হতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (ক) أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ ... بِالْمُهْتَدِيْنَ - প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথে আহ্বান করো এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং কে আছে সঠিক পথে।

আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করার সময় দু'টি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে : (এক) প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা, (দুই) সদুপদেশ।

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের মত চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন-মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি নজর রেখে এবং একই সঙ্গে পরিবেশ

পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। কোন ব্যক্তি বা দলের মুখোমুখী হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে, তারপর এমন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা করতে হবে যা তার মন-মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

সদুপদেশের দুই অর্থ হয়। (এক) যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শুধু যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না, বরং তার আবেগ অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে। দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতাকে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাতিল করলে হবে না, বরং মানুষের প্রকৃতিতে এসবের বিরুদ্ধে যে জন্মগত ঘৃণা রয়েছে তাকেও উদ্দীপিত করতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতির ভয় দেখাতে হবে। ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ ও সৎ কাজে আত্মনিয়োগ শুধু যে ন্যায়সঙ্গত ও মহৎ গুণ, তা শুধু যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করলেই চলবে না, বরং সেগুলোর প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করতে হবে।

(দুই) উপদেশ এমনভাবে দিতে হবে যাতে আন্তরিকতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যাকে উপদেশ দান করা হচ্ছে সে যেন একথা মনে না করে যে, উপদেশদাতা তাকে তাচ্ছিল্য করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে। বরং সে অনুভব করবে উপদেশদাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভাল চায়।

উপদেশ যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই, মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্যবানে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করে দিয়ে নিজের গলাবাজি করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্য হবে না, বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ করতে হবে। যুক্তি প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুয়েমি এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ দেখা না দেয়। সোজাসোজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, সে কূটতর্কে লিপ্ত হতে যাচ্ছে তখনই তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে

দিতে হবে, যাতে ভ্রষ্টতার নোংরা কাদামাটি সে নিজের গায়ে আরো বেশী করে মেখে নিতে পারে।

(খ) - وَاِنْ عَاقَبْتُمْ ... وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ - "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম। তুমি সবর অবলম্বন করো, আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সুযোগ দানের ফলমাত্র। এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহর তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন এবং যারা সৎ কর্মপরায়ণ।"

প্রতিশোধ গ্রহণ ও হক আদায়ের ব্যাপারে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ইমাম ইবনু সীরীন প্রমুখ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ - আল্লাহ্ তায়ালার এই উক্তির ভাবার্থ বর্ণনায় বলেন : "যদি কেউ তোমার নিকট থেকে কোন জিনিস নিয়ে নেয় তবে তুমিও তার নিকট থেকে ঐসম পরিমাণ জিনিস নিয়ে নাও।" যখন কিছু প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আক্ষেপ করে বলেন, যদি আল্লাহ্ তায়ালা অনুমতি দিতেন তবে অবশ্যই আমরা এই নরাধমদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। পরে এটা জিহাদের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

উহুদের যুদ্ধে যখন হামযা (রা)-কে শহীদ করা হয় তখন নবী (সা) তাঁর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন এবং বলতে থাকেন, হায়! এর চেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর কি হতে পারে যে, সম্মানী পিতৃব্যের মৃত দেহের টুকরাগুলো চোখের সামনে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, "এই মুশরিকরা যখন এ কাজ করেছে তখন তাদের দূরবস্থা এরূপই করবো," ঠিক তখনই মদীনায় এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন।

মক্কা বিজয়ের পর কয়েক ব্যক্তি ছাড়া আর সবাইকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। যাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হলো না তাদের নামগুলোও তিনি ঘোষণা করলেন। ঐ সময় আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

যারা আল্লাহকে ভয় করে সব ধরনের খারাপ পথ থেকে দূরে থাকে এবং সর্বদা সৎ কর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, অন্যেরা তাদের সাথে যতই খারাপ আচরণ করুক না কেন তারা দুষ্কৃতির মাধ্যমে তার জবাব দেয় না, বরং জবাব দেয় সুকৃতির মাধ্যমে।

শিক্ষা : (১) তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান কর বুদ্ধিমত্তা ও সদুপদেশ সহকারে।

(২) প্রতিশোধ গ্রহণ কর সমপরিমাণে। তবে প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্য ধারণ করাই সর্বোত্তম।

(৩) তাকওয়া অবলম্বনকারী ও সৎকর্মশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন।

বাস্তবায়ন : আল্লাহর পথে হিকমতের সাথে মানুষকে আহ্বান করা– তাতো সবচাইতে উত্তম কাজ। দুনিয়াতে যত কথা আছে সব কথার চেয়ে একথাটাই উত্তম।

সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা আল্লাহর দিকে আহ্বান করবো– এ প্রত্যাশা নিয়েই আমি আমার দারস শেষ করছি। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ১৩

মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

৬৩. সূরা মুনাফিকূন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১১, রুকূ-২

আলোচ্য : ৯-১১ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ (١٠) وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ (١١) وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে) (৯) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১০) আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তোমাদের কারো মরণ আসার আগেই খরচ করো। অন্যথা সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে আরও একটু সময় দিলে না কেন, তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং নেককার লোকদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম? (১১) অথচ যখন কোন ব্যক্তির (মৃত্যুর) নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেসব বিষয়ে খবর রাখেন।

শব্দার্থ : لَا - না, تُلْهِكُمْ - তোমাদের গাফেল বা উদাসীন করে, يَفْعَلْ -

যে/যারা করবে, اَلْخٰسِرُوْنَ - ক্ষতিগ্রস্ত, اَنْفِقُوْا - তোমরা খরচ কর, رَزَقْنٰكُمْ - আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, قَبْلَ - পূর্বে, يَاْتِىَ - আসে, اَحَدَكُمُ - তোমাদের কারও, اَلْمَوْتُ - মৃত্যু, فَيَقُوْلَ - তখন সে বলবে, لَوْ - কেন, اَخَّرْتَنِىْ - আমাকে অবকাশ দিলে, اَجَلٍ কাল, সময়, قَرِيْبٍ - কিছু, নিকট, فَاَصَّدَّقَ - তাহলে আমি সাদকা করতাম, اَكُنْ - আমি হতাম, الصّٰلِحِيْنَ - নেককারদের, يُؤَخِّرَ - অবকাশ দেন, نَفْسًا - কোন ব্যক্তিকে, جَاءَ - আসে, اَجَلُهَا- তার নির্ধারিত সময়, خَبِيْرٌ - খবর রাখেন, بِمَا - যা কিছু, تَعْمَلُوْنَ - তোমরা কাজ করো।

সূরার নামকরণ : এই সূরার প্রথম আয়াত اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ - উল্লেখিত মুনাফিকূন শব্দটিকে এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরার নামকরণ কুরআনের অন্যান্য সূরা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ এই সূরার বিষয়বস্তুই হলো মুনাফিকদের আচরণ ও কাজকর্মের সমালোচনা ও পর্যালোচনা প্রসঙ্গে। সুতরাং এই সূরার নামকরণ বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখেই করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল : ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ থেকে রাসূলে করীম (সা)-এর ফেরার পথে অথবা মদীনায় পৌছে যাবার পরপরই এই সূরা নাযিল হয়। গোটা সূরাটি একই সময় অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু : এই সূরায় মুনাফিকদের আচার-আচরণ এবং তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযূল : মুস্তালিক গোত্রের সর্দার হারিস ইবনে দিরার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারিস হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)র পিতা ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হন। পরে হারিসও মুসলমান হয়ে যান। সংবাদ পেয়ে রাসূল করীম (সা) একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য রওয়ানা দেন। এই

যুদ্ধে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইসহ একদল মুনাফিক গণীমতের মালের ভাগীদার হবার লোভে অংশ নেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মুজাহিদ বাহিনীসহ মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছলেন, তখন মুরাইসী নামে পরিচিত একটি কূপের নিকট হারিস ইবনে দিরারের বাহিনীর মুকাবিলা হলো। এ কারণে এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। বনী মুস্তালিক গোত্রকে পরাস্ত করার পর ইসলামী সেনাবাহিনী তখনও মুরাইসী কূপের আশেপাশের জনবসতিতে অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ পানি নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জাহ্জাহ্ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত ওমরের কর্মচারী। অপরজন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়ারার আল-জুহানী। তাঁর গোত্র খাজরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। মৌখিক বাদানুবাদ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে, এমনকি সংঘর্ষের রূপ নেয়। জাহ্জাহ্ সিনানকে একটি লাথি মারে। সিনান সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে আহ্বান জানায় এবং জাহ্জাহও মুহাজিরদের আহ্বান জানায়। উভয়ের সাহায্যের জন্য কিছু লোক এগিয়ে এলো। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সা) খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে গেলেন এবং ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন : مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ - "একি জাহেলী যুগের ডাক!" দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে পুঁজি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন- دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ এই (জাহেলী) শ্লোগান বন্ধ করো। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান।" তিনি বললেন : প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য করা– সে যালেম হোক অথবা মযলুম হোক। যালেমকে সাহায্য করার অর্থ হলো, তাকে যুলুম করা থেকে রক্ষা করা। মযলুমের সাহায্য করার অর্থ হলো, তাকে যুলুম থেকে রক্ষা করা এবং যালেমের হাত চেপে ধরা– সে নিজের ভাই হোক অথবা নিজের বাপ হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা জাহেলিয়াতের দুর্গন্ধযুক্ত শ্লোগান। এর প্রতিফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই উপদেশ বাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেলো। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহজাহর বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হলো। তার লাথির আঘাতে আনসারী সিনান আহত হয়েছিল। হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী যালেম ও মযলুম উভয়েই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেলো।

মুনাফিকদের যে দলটি গণীমতের মালের ভাগ পাবার লোভে মুসলমানদের সাথে এসেছিল, তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেলো, তখন সে এটাকে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরাবার একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে (যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবলমাত্র যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন) আনসারদেরকে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বললো, তোমরা মুহাজিরদেরকে নিজের দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত-পালিত হয়ে এখন তোমাদের ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করো না। এতে তারা আপনা আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের দায়িত্ব হলো, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে অসম্মানী লোকদেরকে বের করে দেবে।

সম্মানী বলে সে বুঝাচ্ছিলো তারা নিজের মুনাফিক দল ও আনসারদেরকে এবং বাজে ও অসম্মানী লোক বলে বুঝাচ্ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামদের। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) একথা শুনামাত্রই বললেন, আল্লাহর কসম! তুই-ই বাজে অসম্মানিত ও ঘৃণিত লোক। আর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) মুনাফিকদের মজলিস থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে

দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হলো। যাদের ইবনে আকরাম বয়সে তরুণ থাকায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন : হে ছেলে! দেখো, তুমি আবার মিথ্যা বলছো না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন, না, আমি মিথ্যা বলছি না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কোন রকম বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে আগের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সর্দারের এই কথা গোটা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আকরাম (রা)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি নিজের জাতির নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছ। এতে যায়েদ (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! গোটা খাজরাজ গোত্রের মধ্যে আমার নিকট আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া আর কেউ প্রিয় নেই। কিন্তু যখন সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার বাপও এমন কথা বলতেন তবে আমি তাও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে দিতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রা) ব্যাপারটি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, আপনি আমাকে অনুমতি না দিলে আনসারদের মধ্য থেকে আব্বাদ ইবনে বিশরকে নির্দেশ দেন, সে তার মাথা কেটে আপনার সামনে এনে হাজির করুক।

রাসূলুল্লাহ (সা) তার এ কথায় বললেন : ওমর! এটা হয় না। এতে লোকেরা বলবে, দেখো! মুহাম্মদ (সা) নিজেই তার সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করছে। হযরত ওমর (রা)-এর কথা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্র জানতে পারলেন। তার নামও ছিলো আবদুল্লাহ। তিনি খাটি মুসলমান ছিলেন। তিনি সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে হাজির হয়ে আরয করলেন, যদি আপনি আমার পিতাকে এসব আপত্তিকর কথা বলার জন্য হত্যা করার ইচ্ছা করেন, তাহলে আমাকেই আদেশ করুন, আমি তার মাথা

কেটে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বেই আপনার নিকট হাজির করে দেবো। তিনি আরও বললেন, গোটা খাজরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের কেউ আমার চেয়ে বেশী বাপ-মার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোনো বিষয় সহ্য করতে পারবো না। আমার ভয় হয় যে, আপনি যদি আমার পিতাকে হত্যা করার জন্য অন্য কাউকে আদেশ করেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখে হয়তো আত্মসম্বরণ করতে পারবো না। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবদুল্লাহ! তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর নবী (সা) হঠাৎ সফর শুরু করার নির্দেশ দিলেন। অথচ নবী (সা)-এর স্বাভাবিক রীতি ও অভ্যাস অনুসারে তা তাঁর যাত্রার উপযুক্ত সময় ছিল না। ক্রমাগত ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত সফর অব্যাহত থাকলো। এমনকি লোকজন ক্লান্তিতে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়লো। তখন তিনি এক স্থানে তাঁবু করে অবস্থান করলেন। ক্লান্তশ্রান্ত লোকজন মাটিতে পিঠ ঠেকানো মাত্র গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এই কাজ তিনি এজন্য করলেন যাতে, মুরাইসী কূপের পাশে যে ঘটনা ঘটেছিল মানুষের মন-মগজ থেকে তা মুছে ফেলা যায়।

সফর থেকে ফেরার পথে লোকজন ইবনে উবাইকে বললো, তুমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ক্ষমা চাও। কিন্তু সে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল, তোমরা বললে, তাঁর উপর ঈমান আন। আমি ঈমান আনলাম। তোমরা বললে, অর্থ-সম্পদের যাকাত দাও। আমি যাকাতও দিলাম। এখন তো শুধু মুহাম্মাদকে আমার সিজদা করা বাকী আছে। এসব কথা শুনে ঈমানদার আনসারদের অসন্তুষ্টি তার প্রতি আরও বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক থেকে তার প্রতি ধিক্কার ও তিরস্কার বর্ষিত হতে লাগলো। যে সময় এ কাফেলা মদীনা প্রবেশ করছিল, তখন আবদুল্লাহ ইবনের উবাইয়ের পুত্র (তার নামও) আবদুল্লাহ খোলা তরবারি হাতে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং

বললেন, "আপনিই তো বলেছেন, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা হীন ও নীচ লোকদের সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। এখন আপনি জানতে পারবেন, সম্মান আপনার না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না।" এতে ইবনে উবাই চিৎকার করে বললো, "হে খাজরাজ গোত্রের লোকেরা! দেখো, আমার নিজের ছেলেই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে।" লোকজন গিয়ে নবী (সা)-কে খবর দিলে তিনি বললেন : "আবদুল্লাহকে গিয়ে বলো, তার পিতাকে যেন নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেয়।" তখন আবদুল্লাহ বললেন, "নবী (সা) অনুমতি দিয়েছেন তাই এখন আপনি প্রবেশ করতে পারেন।" এই সময় নবী (সা) ওমর (রা)-কে বললেন : "হে ওমর! এখন তোমার মতামত কি? যে সময় তুমি বলেছিলে, আমাকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন, সে সময় তুমি যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে অনেকেই নাক ছিটকাতো এবং নানা রকম কথা বলতো। কিন্তু আজ যদি আমি তাকে হত্যার আদেশ দেই তাহলে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা যেতে পারে।" হযরত ওমর বললেন, "আল্লাহর শপথ! এখন আমি বুঝতে পেরেছি, আল্লাহর রাসূলের কথা আমার কথার চেয়ে অনেক যুক্তিসঙ্গত ছিল।" এই পরিস্থিতি ও পটভূমিতে অভিযান শেষে নবী (সা) মদীনায় পৌঁছার পর এ সূরা নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা : (ক) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।"

সূরার প্রথম রুকূতে মুনাফিকদের মিথ্যা কসম ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বতে জড়িত হওয়াই ছিল এসব কিছুর সারমর্ম। এজন্যই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে সুযোগ-সুবিধা ও গণীমতের মালের ভাগ বসানোর জন্য নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রচার করতো। মুহাজির সাহাবীদের পিছনে

আনসারদের পক্ষ থেকে সাহায্য করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত মুনাফিকরা করেছিল এর পেছনেও এই একই কারণ নিহিত ছিল।

দ্বিতীয় রুকূতে মুনাফিকী মিশ্রিত মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের মত দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে যেয়ো না। যেসব জিনিস মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয় তার মধ্যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বেশী কাজ করে। সূরা তাগাবুনে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে ফেৎনা বা পরীক্ষা বলে উল্লেখ করেছেন : اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ (তাগাবুন-১৫)। আসলে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়াই সকল অন্যায় কাজের মূল কারণ। মানুষ স্বাধীন নয়, বরং এক আল্লাহর বান্দা। একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজকর্মের হিসাব তাকে দিতে হবে। একথা স্মরণে থাকলে মানুষ কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না। মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি কখনও পদস্খলন ঘটে যায় তাহলে সম্বিত ফিরে আসা মাত্র সে যেনো তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়।

(খ) وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির মহব্বতে আল্লাহকে ভুলে যাবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুনিয়ার স্বার্থের জন্য নিজেকে মুসলমানদের কাতারে রাখবে, এর পরিণতি অবশ্যই মুনাফিকদের মতই হবে। আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - "নিশ্চয়ই মুনাফিকদের পরিণতি হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।" (নিসা : ১৪৫)

(গ) وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - "আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তোমরা তা থেকে খরচ কর।"

মরণের আলামত দেখা দেয়ার আগে, শরীর ও মন ভাল থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার কথা বলা হয়েছে। মরণের পর এ ধন-সম্পদ তোমার মালিকানায় থাকবে না এবং তোমার কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহর ইবাদত থেকে মানুষকে ভুলিয়ে রাখার বড় মাধ্যম হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই আর্থিক ইবাদত যাকাত, ওশর ও হজ্জ ইত্যাদির উল্লেখ আলাদাভাবে করা হয়েছে।

মৃত্যুর আলামত যখন আরম্ভ হয়ে যায়, তখন কারও সাধ্য থাকে না এবং কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামায, রোযা ও হজ্জ আদায় করে নেবে। আর ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা সামনে উপস্থিত থাকে, আর সে বুঝে যে এখন এই ধন-সম্পদ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাই সে আর্থিক ইবাদতের দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মরতে মরতে বলে, এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে লাগাও।

হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করলো, কোন দানে আল্লাহ্ তায়ালা বেশী খুশী হন? তিনি বললেন : "যে সাদকা বা দান সুস্থ অবস্থায় এবং গরীব হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকা অবস্থায় করা হয়।" নবী করীম (সা) আরও বললেন: "আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্ব করো না যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত এবং তুমি মরতে থাকো আর বলো, এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, আর এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।" (বুখারী, মুসলিম)

দুনিয়ার জীবনে আমরা দেখতে পাই, প্রচুর ধন-সম্পদের আশায় কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ ব্যস্ত থাকে। সূরা তাকাছুরে আল্লাহ বলেন :

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - "প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এমনভাবে গাফেল করে রাখে যে, তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।" অর্থাৎ তোমাদের মরণ এসে যায়। তোমরা আল্লাহর কাজে সময় দিতে পার না এবং তাঁর পথে অর্থ খরচ করারও সুযোগ করে উঠতে পার না।

(ঘ) فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ.

“অতপর সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও একটু সময় বাড়িয়ে দিলে না কেন? তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম এবং নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।”

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তির হজ্জ, যাকাত, নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কাজগুলো বাকী ছিল, আদায় করতে পারেনি, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট আফসোস ও বাসনা প্রকাশ করে বলবে, আমার মরণ আরও একটু দেরীতে দাও, যাতে আমি দান-সাদকা ও ফরয কাজগুলো আদায় করে নেক বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যেতে পারি।

(ঙ) - وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا - “যখন কোন ব্যক্তির (মরণের) নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা কাউকেও অবকাশ দেন না।”

কোন প্রাণীর মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে পড়লে আল্লাহ তায়ালা তা আর বিলম্বিত করেন না। এটা তাঁর নীতি নয় যে, তার জন্য যে মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রয়েছে তার এদিক ওদিক করা। তার মৃত্যুর সময় এসে গেলে অবশ্যই তাকে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হবে। তোমাদের এই নিরর্থক বাসনা পূর্ণ করার কোন সুযোগ আল্লাহ তায়ালার নিকট নেই।

(চ) - وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - “আর তোমরা যা কর, আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।”

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ও মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরীর বর্ণনা দেয়ার পর এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে মুমিনদেরকে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন তা উল্লেখ করার পর একটি মাত্র আয়াতে বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাতে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, ঈমানের দাবীসমূহ পূরণে তাদের আব চুপ করে বসে থাকা সঙ্গত নয়, বরং সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। মুমিনের একমাত্র আশ্রয়স্থল যে আল্লাহ তায়ালা, তার স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা এই কুরআন দ্বারা মুসলমানদের চরিত্র গঠন করেন।

শিক্ষা : সূরা মুনাফিকূনের দ্বিতীয় রুকূর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর আমাদের জন্য যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। মুনাফিকী আচরণ বর্জন করে নির্ভেজাল ঈমানার হতে হবে।

২। মানসম্মান ও যমীনের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। হালাল উপায়ে ধন-সম্পদ কামাইয়ের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রাচুর্য গড়ার জন্য দুনিয়াদারীতে ডুবে যাওয়া যাবে না।

৩। আপনাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত যেন আপনাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।

৪। আল্লাহ আপনাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন, মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করুন।

৫। যখন কারও মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আল্লাহ তাকে আর অবকাশ মোটেই দেন না।

৬। আপনারা যা কিছু করেন সে বিষয়ে আল্লাহ পুরাপুরি অবহিত। কাজেই সর্বদা মরণকে স্মরণের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করুন।

বাস্তবায়ন : মুনাফিকী আচরণ বর্জন করে মরণের আগে জীবনের প্রথম থেকেই আল্লাহর পথে খরচ, সৎ আমলের চেষ্টা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার তদবিরের মাধ্যমে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাহ হবার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করা দরকার। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

দারস : ১৪

ঈমান ও ঈমানহীন দু'টি বিপরীতমুখী জীবনের পরিণতি

৯২. সূরা আল-লাইল

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-২১, রুকূ-১

আলোচ্য : ১-১১ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى - (٢) وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى - (٣) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى - (٤) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى - (٥) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - (٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - (٧) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى - (٨) وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - (٩) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - (١٠) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى - (١١) وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "রাতের কসম যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। (২) দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়। (৩) আর সেই সত্তার কসম যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (৪) আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা ধরনের। (৫) কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ দান করলো, (আল্লাহর নাফরমানী থেকে) আত্মরক্ষা করলো (৬) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য মেনে নিল, (৭) তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজতা দিব। (৮) আর যে কার্পণ্য করলো (আল্লাহর প্রতি) বিমুখ হলো (৯) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করলো, (১০) তার জন্য আমি শক্ত ও দুষ্কর পথের সহজতা বিধান করবো। (১১) তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।

শব্দার্থ : لَيْلٌ - রাত, يَغْشٰى - আচ্ছন্ন করে, نَهَارِ - দিন, تَجَلّٰى - উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়, ذَكَرَ - পুরুষ, اُنْثٰى - মহিলা, سَعْىٌ - চেষ্টা, لَشَتّٰى - বিভিন্ন ধরনের, اَعْطٰى - দান করলো, تَقٰى - আল্লাহকে ভয় করলো, صَدَّقَ - সত্যকে মেনে নিল, حُسْنٰى - কল্যাণ ও মঙ্গল, فَسَنُيَسِّرُ - আমি সহজতা দান করব, يُسْرٰى - সুখ বা সহজ, عُسْرٰى - দুঃখ বা কঠিন, يُغْنِىْ - তাকে অমুখাপেক্ষী করেনি, تَرَدّٰى - সে ধ্বংস হবে, عَلَيْنَا - আমাদের দায়িত্বে, هُدٰى - পথ প্রদর্শন।

নামকরণ : এই সূরার প্রথম শব্দ وَالَّيْلِ কে এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। وَالَّيْلِ - অর্থ রাত্রি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : মানব জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং এর পরিণাম ও ফলাফলের তারতম্য বর্ণনা করাই এই সূরার বিষয়বস্তু।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের সাথে সূরা আশ-শামস-এর অনেক মিল রয়েছে। এই মিল এতখানি যে, মনে হয় সূরা দু'টির একটি অপরটির ব্যাখ্যা বা তাফসীর। মূল বক্তব্য একই বা অভিন্ন। সূরা শামস-এ তা একভাবে বুঝানো হয়েছে, আর এ সূরায় তাই বুঝানো হয়েছে ভিন্নভাবে। এই কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই দু'টি সূরা একই সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (ক) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - "যে লোক (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ দান করলো, (আল্লাহর নাফরমানী থেকে) আত্মরক্ষা করলো এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য মেনে নিল।

এটা মানুষের এক ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা। এতে তিনটি জিনিস গণ্য করা হয়েছে। এই তিনটি জিনিস সমগ্র বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের সমন্বয়। (এক) মানুষ অর্থ পূজায় পড়বে না। উন্মুক্ত মনে ধন-সম্পদ আল্লাহ যতটুকুই তাকে দিয়েছেন, আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের হক আদায় করায়, ভাল ও কল্যাণময় কাজে, সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনে ও সাহায্যের কাজে ব্যয় করে।

(দুই) তার দিলে আল্লাহর ভয় চিরজাগরুক থাকবে। নৈতিকতা, কাজ কর্ম, সমাজ-সামাজিকতা, জীবিকা ও অর্থ ব্যবস্থা নিজ জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর অসন্তোষ উদ্রেককারী সর্বপ্রকার কাজ হতে বিরত থাকবে। (তিন) সত্য ও মঙ্গলকে সত্য ও যথার্থ বলে মেনে নিবে।

বস্তুত ভাল ও কল্যাণ অতীব ব্যাপক অর্থসম্পন্ন শব্দ। তা মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভাল ও কল্যাণের স্বীকৃতি হয় এভাবে যে, মানুষ শিরক, নাস্তিকতা ও কুফরী পরিত্যাগ করে তাওহীদ, আল্লাহর সার্বিক একত্ব, পরকাল ও নবুওয়াত-রিসালাতকে পরম সত্য বলে মেনে নেবে। আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া জীবনব্যবস্থাকে নির্ভুল মেনে নেবে। এতে ভাল ও কল্যাণের সব রূপ ও ধরনকে একটি সূত্রে গেঁথে দেয়া হয়েছে। এরই সার্বিক ও ব্যাপক নাম শরীয়ত। এই শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালকেই ভাল মেনে নিবে এবং এই ভালকেই অনুসরণ করবে।

(খ) - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - "তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজতা দিব।" এটা পূর্বোক্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফল। সহজ পথ বলতে বুঝায় সেই পথ যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, যা মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহর মর্জির অনুরূপ। এ পথে বিবেকের সাথে লড়াই করে চলতে হয় না। পাপ-পংকিল জীবনে মানুষকে প্রতিনিয়ত যে যুদ্ধ, প্রতিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়, এ পথে চলতে সে সবের সম্মুখীন হতে হয় না। মানব সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আনুকূল্য, শান্তি, সুখ ও মান-মর্যাদার পুরস্কার দিয়ে তাকে বরণ করা হবে। যে লোক কারও সাথে বেঈমানী, বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভঙ্গের অপরাধ করে না, লোকেরা যার যুলুম ও অসদাচরণের ভয়ে ভীত হয় না, নির্বিশেষে সব মানুষের সাথে যার আচরণ খুবই নম্র ও ভদ্র, যার স্বভাব-চরিত্রে আপত্তিজনক কোন দোষ থাকে না, সে যত খারাপ সমাজে বসবাস করুক না কেন, তার সম্মান ও মর্যাদা অবশ্যই হবে। সাধারণ মানুষের হৃদয় ও মন তার প্রতি আকৃষ্ট হবেই। তার নিজের হৃদয় ও মন পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত থাকবে। সমগ্র সমাজে তার এমন মান-মর্যাদা হবে যা কোন চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনও আশা করতে পারে না।

সূরা নাহলে একথাই বলা হয়েছে :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ـ

"যে ঈমানদার ব্যক্তি নেক আমল করবে– সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী লোক, তাকে আমি উত্তম জীবন যাপন করার সুযোগ দিব।" (আয়াত : ৯৭)

এরপর সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ـ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, রহমান আল্লাহ তাদের জন্য লোকদের মনে অবশ্যই ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।" (আয়াত : ১৬) এ পথে মানুষ দুনিয়া থেকে পরকাল পর্যন্ত কেবল সুখ আর সুখ, আনন্দ আর আনন্দই লাভ করে। আনন্দ আর প্রশান্তি একমাত্র এ পথেই। এ সুখ-সুবিধা অস্থায়ী নয়, চিরস্থায়ী ও চিরন্তন।

মহান আল্লাহ এ সম্বন্ধে বলেছেন, যে ব্যক্তি কল্যাণ ও মঙ্গলকে স্বীকার করে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এটাই তার চলার পথ, আর কার্যত আর্থিক ত্যাগ ও আল্লাহভীতির জীবন যাপন করে প্রমাণ করবে যে, তার স্বীকৃতি সত্য, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ এ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেবেন। এ সময় থেকে নেকী করা তার জন্য সহজ আর গুনাহ করা কঠিন হয়ে যাবে। হারাম সম্পদ তার নাগালে এলে সে তা গ্রহণ করবে না। ব্যভিচারের সুযোগ সে পাবে, কিন্তু তাকে ইন্দ্রিয়লিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগ মনে করে সেই সুযোগ সে গ্রহণ করবে না, বরং জাহান্নামের দরজা মনে করে তা থেকে পালিয়ে যাবে। নামায তার জন্য কঠিন মনে হবে না, বরং নামাযের ওয়াক্ত হলে নামায না পড়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। যাকাত দিতে তার মনে কষ্ট হবে না, বরং যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত নিজের ধন-সম্পদ তার নিকট অপবিত্র মনে হবে। মোটকথা পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পথে চলার সুযোগ-সুবিধা সে পেতে থাকবে। অবস্থা ও পরিস্থিতিকে তার উপযোগী বানিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূরা আল-বালাদে এ পথকে বলা হয়েছিল দুর্গম পার্বত্য পথ, আর এখানে বলা হচ্ছে সহজপথ। এ দুই দিককে কিভাবে এক করা যাবে? জবাবে বলা যায়, এ পথ অবলম্বন করার পূর্বে এ পথকে মানুষের নিকট দুর্গম পার্বত্য পথই মনে হয়। এ দুর্গম পার্বত্য পথে চলার জন্য তাকে নিজের প্রবৃত্তির লালসা, নিজের বৈষয়িক স্বার্থের অনুরাগী পরিবার-পরিজন, নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও কাজ-কারবারের সঙ্গীগণ এবং সবচেয়ে বেশী শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয়। এরা এ পথকে ভীতিপ্রদ বানিয়ে তার সামনে হাজির করে। কিন্তু যখন মানুষ সৎ, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের স্বীকৃতি দিয়ে সে পথে চলার দৃঢ় সংকল্প করে, ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং তাকওয়ার নীতি অলবম্বন করে, কার্যত এ সংকল্পকে পাকাপোক্ত করে নেয়, তখন এ দুর্গম পথ পাড়ি দেয়া সহজ এবং নৈতিক অবনতির গভীর খাদে গড়িয়ে পড়া তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

(গ) - وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - (গ) "আর যে কার্পণ্য করল, (আল্লাহর প্রতি) বিমুখ হল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করল।"

এটি দ্বিতীয় ধরনের প্রচেষ্টা। প্রথম ধরনের প্রচেষ্টার সাথে পদে পদে রয়েছে এর অমিল। কৃপণতা মানে প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়, বরং এখানে কৃপণতা বলতে আল্লাহর পথে এবং নেকী ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে। এদিক বিচার করলে এমন ব্যক্তিকেও কৃপণ বলা যায়, সে নিজের জন্য, নিজের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যাসনের স্বার্থে এবং নিজের ইচ্ছামত খুশী ও আনন্দ বিহারে দু'হাতে টাকা উড়ায়; কিন্তু কোন ভাল কাজে তার পকেট থেকে একটি পয়সাও বের হয় না। অথবা কখনও বের হলেও তার পিছনে থাকে দুনিয়ার খ্যাতি, যশ, শাসকদের নৈকট্য লাভ বা অন্য কোন রকমের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার। আল্লাহর প্রতি বিমুখ হওয়ার অর্থ দুনিয়ার বৈষয়িক লাভ ও স্বার্থকে নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের লক্ষ্যে পরিণত করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়া। কোন কাজে আল্লাহ খুশী হন আর কোন কাজে আল্লাহ নাখোশ হন, তার কোন তোয়াক্কা না করা।

(ঘ) - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ - "তার জন্য আমি শক্ত ও দুষ্কর পথের সহজতা বিধান করবো।"

কঠিন পথে চলার কারণ এই যে, এ পথে যে চলতে চায়, সে যদিও বৈষয়িক লাভ, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও বাহ্যিক সাফল্যের লোভে এদিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু এখানে সর্বক্ষণ তাকে নিজের প্রকৃতি, বিবেক, বিশ্বজাহানের স্রষ্টার তৈরী করা আইন এবং চারপাশের সমাজ-পরিবেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ও নীতি-নৈতিকতার সীমালঙ্ঘন করে যখন সে সর্বপ্রকার নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ করার চেষ্টা চালায়, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হতে থাকে এবং সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে, তখন নিজের চোখেই সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয় এবং যে সমাজে সে বাস করে, সেখানে তাকে প্রতি পদে পদে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। সে দুর্বল হলে এসব কার্যকলাপের জন্য তাকে নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর সে ধনী, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে সারা দুনিয়া তার শক্তির সামনে মাথা নত করলেও কারো মনে তার জন্য সামান্যতম শুভাকাঙ্ক্ষা, সম্মানবোধ ও ভালবাসার প্রবণতা জাগে না। এমনকি তার কাজের সাথী-সহযোগীরাও তাকে একজন খারাপ ও দুর্বৃত্ত হিসেবেই গণ্য করতে থাকে। আর এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী জাতিরাও যখন নৈতিকতার সীমালঙ্ঘন করে নিজেদের শক্তি ও অর্থের বিভ্রমে পড়ে অসৎ কাজে লিপ্ত হয়, তখন একদিকে বাইরের জগৎ তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদিকে তাদের নিজেদের সমাজে অপরাধমূলক কার্যকলাপ, আত্মহত্যা, নেশাখোরি, দুরারোগ্য ব্যাধি, পারিবারিক নিপীড়নের ধ্বংস, যুব সমাজের অসৎ পথ অবলম্বন, শ্রেণী সংঘাত এবং যুলুম-নিপীড়নের বিপুলাকার রোগে আক্রান্ত হয়। এমনকি উন্নতির উচ্চতম শিখরে থেকে একবার পতন ঘটার পর ইতিহাসের পাতায় তাদের জন্য কলঙ্ক, লানত ও অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

আর এ ধরনের লোককে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দেবো, একথা বলার মানে হচ্ছে, তার থেকে সৎ পথে চলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসৎ পথে চলার দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হবে। অসৎ কাজ করার যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হবে। খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ হবে এবং ভাল কাজ করার চিন্তা তাঁর মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সে মনে করবে, এই বুঝি তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থাটিকেই কুরআনে অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে :

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

"আল্লাহ যাকে পথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তার মনকে সংকীর্ণ করে দেন এবং এমনভাবে তাকে সংকুচিত করতে থাকেন যে, (ইসলামের কথা চিন্তা করতেই) তার মনে হতে থাকে যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্য থেকে দূরে পলায়ন ও সত্যের প্রতি ঘৃণার) আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের উপর চাপিয়ে দেন।" (আনয়াম : ১২৫)

আর এক জায়গায় বলা হয়েছে : "নামায একটি কঠিন কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু আল্লাহর অনুগত বান্দার জন্য নয়।" (বাকারা : ৪৬)

আর মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তারা নামাযের দিকে এলে গড়িমসি করে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলেও যেন মন চায় না তবুও খরচ করে।" (আত্-তাওবা : ৫৪)

আরও বলা হয়েছে : "তাদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের উপর জবরদস্তি আরোপিত জরিমানা মনে করে।" (আত্-তাওবা : ৯৮)

(ঙ) - وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى - "তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না? যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

একদিন তাকে অবশ্যই মরতে হবে। এখানে আয়েশ-আরামের জন্য সে যা কিছু সংগ্রহ করছে, সব এ দুনিয়াতেই রেখে যেতে হবে। সে যদি নিজের আখেরাতের জন্য এখান থেকে কিছু কামাই করে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার এ সম্পদ তার কোন কাজে লাগবে? সে তো কোন দালান-কোঠা, মোটরগাড়ী, সম্পত্তি বা জমানো অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে কবরে যাবে না।

শিক্ষা : ১। মানুষের বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টা দু'টি দিকে বিভক্ত। একটি আল্লাহর পথে, অপরটি শয়তানের পথে।

২। যে আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিল, আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে (দীন ইসলামকে) সত্য মেনে নিল, তাকে আল্লাহ সৎ পথে চলার সহজতা দিবেন।

৩। আর যে কৃপণতা করলো, আল্লাহর প্রতি বিমুখ হলো এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করলো, তার জন্য আল্লাহ শক্ত ও দুষ্কর পথের সহজতা বিধান করবেন।

৪। তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে?

বাস্তবায়ন : আসুন দু'টি বিপরীতমুখী রাস্তার মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের রাস্তায় আল্লাহর রেজামন্দির পথে সময় থাকতেই মন-প্রাণ ও ধন-সম্পদ উজাড় করে দিয়ে আমরা সকলে মিলে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ কাজে তাওফীক দান করুন, আমীন। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ১৫

৯৫. সূরা আত্-তীন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৮, রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ - (٢) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ - (٣) وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ - (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - (٥) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ - (٦) اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ - (٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ - (٨) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "শপথ তীন (ডুমুর) ও যায়তূনের, (২) শপথ সিনাই (তূর) পাহাড়ের এবং (৩) এই নিরাপদ নগরীর! (৪) আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়। (৫) তারপর তাকে উল্টো ফিরিয়ে নিম্নতমদেরও নীচে পৌঁছিয়ে দিয়েছি; (৬) তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোন দিন শেষ হবে না। (৭) অতএব, এরপরও কিসে তোমাকে শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করেছে, (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

শব্দার্থ : اَلتِّيْنِ - ডুমুর ফল, اَلزَّيْتُوْنِ - যায়তূন (ফল), طُوْرِ - তূর পাহাড়, بَلَدٌ - শহর/নগর, اَمِيْنٌ - নিরাপদ, لَقَدْ - নিশ্চয়, خَلَقْنَا - আমরা সৃষ্টি করেছি, اِنْسَانٌ - মানুষ, اَحْسَنَ - সর্বোত্তম, تَقْوِيْمٌ - কাঠামোয় গঠন, ثُمَّ - তারপর, رَدَدْنٰهُ - তাকে আমরা পৌঁছে দিয়েছি, রদ করেছি, اَسْفَلَ - অতি নীচে, سٰفِلِيْنَ - নিম্নস্তরের লোক, اِلاَّ - ব্যতীত, اَلَّذِيْنَ - যারা, اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছে, وَعَمِلُوْا - আমল বা কাজ

করেছে, صٰلِحٰتِ - উত্তম, নেক, اَجْرٌ - পুরস্কার, প্রতিদান, مَمْنُوْنٌ - নিরবচ্ছিন্ন, অশেষ, অবিরত, অব্যাহত, يُكَذِّبُ - মিথ্যা মনে করেছে, اَلدِّيْنِ - শেষ বিচারের দিন, اَلَيْسَ - কি নয়? اَحْكَمُ - সর্বোচ্চ বিচারক, حٰكِمِيْنَ - বিচারকগণ।

নামকরণ : সূরার প্রথম শব্দ (اَلتِّيْنِ)-কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। التين - এক প্রকার ফল যা মিসর ও ফিলিস্তীনে উৎপন্ন হয়।

নাযিলের সময়কাল : এটি মাক্কী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা। এ সূরা মাক্কী হবার সুস্পষ্ট আলামত এই যে, এই সূরায় মক্কা শহরের জন্য هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এই নিরাপদ শহরটি) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, যদি তা মদীনায় নাযিল হতো তবে هذا البلد الامين বলা হতো না। কুফর ও ইসলামের সংঘাতের কোন আলামত এই সূরায় পাওয়া যায় না। কাজেই সূরাটি যে মাক্কী যুগের ও প্রথম দিকের এতে কোন সন্দেহ নেই।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি এ সূরার আসল বিষয়বস্তু। সূরার প্রথমেই মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের শপথ করে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। কোথাও বলা হয়েছে, মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং ফেরেশতাকে তার সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন (আল-বাকারা : ৩০ আয়াত)। আবার বলা হয়েছে, আমি বনী আদমকে মর্যাদাশালী করেছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (বনী ইসরাঈল : ৭০ আয়াত)। মানুষ আল্লাহর এমন একটি আমানতের বাহক, যা বহন করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড় কারো ছিলো না (আল-আহযাব : ৭২ আয়াত)। নবুওয়াতের চাইতে উঁচু মর্যাদা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টি লাভ করতে পারেনি। অতি উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা মানুষের মধ্যেই সর্বাধিক উন্নত পদমর্যাদাসম্পন্ন নবী-রাসূলগণের জন্ম হয়েছে। এ দুনিয়ায় দু'ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার পর নৈতিক অধপতনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌঁছে যায়। সেখানে তাদের চাইতে নীচে আর কেউ পৌঁছতে পারে না।

দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ঈমান ও সৎ কাজের মাধ্যমে পতন থেকে রক্ষা পেয়ে সর্বোত্তম স্থানেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানবজাতির মধ্যে এই দুই ধরনের লোকের অস্তিত্ব এমন একটি বাস্তব সত্য যা সর্বকালে, সর্বদেশে মানব সমাজে বিদ্যমান।

মানব সমাজে যারা অধপতনের গভীর গর্তে নেমে গেছে এবং যারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গেছে তাদেরকে যদি কোন প্রতিদান না দেয়া হয় এবং উভয় দলের পরিণতি একই হয়, তাহলে অর্থ এই হয় যে, আল্লাহর রাজত্বে কোন ইনসাফ নেই। অথচ আল্লাহ্, যিনি সকল শাসকের বড় শাসক তিনি ইনসাফ করবেন না, এ ধারণা কেমন করে হতে পারে?

ব্যাখ্যা : (ক) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ - وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ - وَهٰذَا الْبَلَدِ الاَمِيْنِ -
'তীন ও যায়তূনের কসম, কসম তূর-ই সীনার এবং এই নিরাপদ নগরীর।' এখানে তীন (ডুমুর) ও যায়তূন ফল, সীনাই পর্বত ও নিরাপদ শহর মক্কার শপথ করা হয়েছে। এখানে এতগুলো শপথ করার অর্থ হচ্ছে পরবর্তী বাক্যাংশে গুরুত্বপূর্ণ যে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে তার দিকে শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তীন-যায়তূন উৎপন্ন হয় সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকায়। যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত অসংখ্য নবীর জন্ম হয়। তূর পর্বতে হযরত মূসা (আ) নবুওয়াত লাভ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর হাতে মক্কা মুয়াজ্জমার ভিত্তি স্থাপিত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছিলেন : رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا "হে আমার প্রতিপালক! একে একটি নিরাপদ শহরে পরিণত কর।" (বাকারা : ১২৬ আয়াত)। আর এই দোয়ার বরকতে আরব উপদ্বীপের সর্বত্র বিশৃঙ্খলার মধ্যে একমাত্র এই শহরটিই আড়াই হাজার বছর থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-ও এ শহরে পয়দা হন। বাইতুল হারাম (কা'বা) এ শহরেই অবিস্থত। আজও পৃথিবীর সবচাইতে নিরাপদ স্থান পবিত্র মক্কা মুকাররামা। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا - 'আর যে ব্যক্তি এই শহরে প্রবেশ করলো, সে-ই নিরাপদ"। (আলে ইমরান : ৯৭)

(খ) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - "আমি মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।" এখানে বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে– আমি মানব জাতিকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক কাঠামো দান করেছি যা অন্য কোন প্রাণীকে দেইনি। মানুষকে এমন উন্নত পর্যায়ের চিন্তা, উপলব্ধি, জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। আর এ মানবকুলেই নবুওয়াতের ন্যায় মহান মর্যাদার অধিকারী সকল নবীর জন্ম হয়।

تَقْوِيْمٍ-এর শাব্দিক অর্থ- হচ্ছে গঠনগত ভিত্তি (Structural Foundation)। তাই ব্যাপক অর্থে দৈহিক কাঠামো ও স্বভাব-প্রকৃতি উভয়ই বুঝায়। ইবনুল আরাবী বলেন, আল্লাহ ইনসানকে সুন্দর দেহাবয়বেই সৃষ্টি করেননি, বরং তাকে করেছেন জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী ও প্রজ্ঞাবান। বস্তুত এগুলো আল্লাহর সিফাতসমূহের অন্তর্গত।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "নিশ্চয় আল্লাহ আদম (আ)-কে স্বীয় আকারে (সিফাতে) সৃষ্টি করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)। আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হলে সেই ইনসান সন্দেহাতীতভাবে হবে সর্বোত্তম সৌন্দর্যের অধিকারী।

(গ) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ - "তারপর আমি তাকে উল্টো ফিরিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌছে দিয়েছি। সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর যখন মানুষ নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুষ্কৃতির পথে ব্যবহার করে তখন আল্লাহ তাকে দুষ্কৃতিরই সুযোগ দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى - "যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কঠিন পথে চলার সহজতা দিব।" (আল-লাইল : ৮, ৯, ১০ আয়াত)। কোন মানুষ দুষ্কৃতির পথে চলতে গিয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে যেতে যেতে এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌছে যায় যে, অন্য কোন সৃষ্টি এমন পর্যায়ে পৌছতে পারে না। লোভ, লালসা, নীচতা, হীনতা, কামান্ধতা,

নেশাখোরি, স্বার্থবাদিতা, ক্রোধ ইত্যাদি খারাপ স্বভাব যাদেরকে পেয়ে বসে তারা নৈতিক দিক দিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একটি জাতি যখন অন্য একটি জাতির প্রতি শত্রুতা পোষণের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায়, তখন সে হিংস্রতায় দুনিয়ার হিংস্র পশুদেরকেও হার মানায়। একটি হিংস্র পশু কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্য পশু শিকার করে, নিজ জাতির ভাইদেরকেও শিকার করে না। ব্যাপকভাবে পশুদের হত্যা করে চলে না। কিন্তু মানুষ নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে চলেছে। পশুরা দাঁত বা নখর দ্বারা শিকার করে। কিন্তু এই সর্বোত্তম মানুষ নিজের বুদ্ধির সাহায্যে বন্দুক, কামান, আনবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, ট্যাংক, বিমান ও অন্যান্য অসংখ্য মারণাস্ত্র তৈরী করেছে। সেগুলো দ্বারা বিশাল জনপদ ধ্বংস করছে। পশুরা কেবল আহত বা হত্যা করে। কিন্তু মানুষ নিজের মত মানুষকে নির্যাতন করার জন্য এমন সব ভয়াবহ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যেগুলোর কথা পশুরা কল্পনাও করতে পারে না। তারপর নিজেদের শত্রুতা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তারা নীচতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারা মেয়েদের উলংগ করে মিছিল বের করে। একজন মেয়ের উপর দশ বিশজন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাপ ভাই ও স্বামীদের সামনে স্ত্রী ও মা-বোনদের শ্লীলতাহানি করে। মা-বাপের সামনে সন্তানদেরকে হত্যা করে। নিজের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ত পান করার জন্য মাকে বাধ্য করে। মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে ও জীবন্ত কবর দেয়। পৃথিবীর বুকে এমন কোন হিংস্রতম গোষ্ঠী নেই যাদের বর্বরতাকে মানুষের বর্বরতার সাথে তুলনা করা যায়। ধর্ম, যা মানুষের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, তাকেও সে এমন সংকীর্ণ করে দিয়েছে, যার ফলে সে গাছ-পালা, জীব-জন্তু ও পাথরের পূজা করতে করতে অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে নারী ও পুরুষের লিংগেরও পূজা করতে শুরু করেছে। দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্ম মন্দিরে দেবদাসী রাখছে। তাদের সাথে ব্যভিচার করাকে পুণ্যের কাজ মনে করছে। যাদেরকে তারা দেবতা ও উপাস্য মনে করছে, তাদের সাথে সম্পর্কিত দেব কাহিনীতে এমন সব কুৎসিত কাহিনী জুড়ে দিয়েছে যা জঘন্য ও নিকৃষ্টতম মানুষের জন্যও লজ্জার বিষয়।

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ - (ঘ)
"তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করতে থাকে। কেননা তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনদিন শেষ হবে না।"

যেসব মুফাস্‌সির "আসফালা সাফিলীন"-এর অর্থ করেছেন, বার্ধক্যের এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ নিজের চেতনা ও স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তারা এ আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যারা নিজেদের যৌবনকালে ও সুস্থাবস্থায় ঈমান এনে সৎকাজ করে তাদের জন্য বার্ধক্যের এ অবস্থায়ও সেই একই নেকী লেখা হবে এবং তদনুযায়ী তারা প্রতিদানও পাবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে দুর্বলতার জন্য তারা ঐ ধরনের সৎকাজ করেনি বলে তাদের ভালো প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে কিছুই কম করা হবে না। সাধারণভাবে দেখা যায়, যারা আল্লাহ্, রাসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎ কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে নেয় তারা পতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ যে মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছিলেন তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই তারা অশেষ শুভ প্রতিদানের অধিকারী। তারা এমন পুরস্কার পাবে যা তাদের যথার্থ পাওনা থেকে কম হবে না এবং যার ধারাবাহিকতা কোন দিন শেষও হবে না।

(ঙ) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ - اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ - "অতঃপর কিসে তোমাকে শেষ বিচার দিন সম্পর্কে অবিশ্বাসী করেছে। আল্লাহ কি সকল বিচারকের চাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?" 'ইউকাযযিবু' অর্থ-মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া, অবিশ্বাসী বানায়, মানতে অস্বীকার করায়। 'কা' অর্থ তুমি, তোমার, তোমাকে। দুনিয়ায় পার্থিব জীবনে বেঈমানীর পথ সুস্বাচ্ছন্দ দেখে মানুষের নফস্ সেদিকে ধাবিত হয়। তার কর্মকাণ্ড হয় আখেরাতে অবিশ্বাসীর মত। অর্থাৎ ভালো ও মন্দের বিচারের কথা তার বিশ্বাসই হয় না।

দুনিয়ার ছোট ছোট বিচারকের কাছ থেকেও যখন মানুষ ইনসাফ ও সুবিচার আশা করে এবং দাবী করে যে, দোষীকে শাস্তি দেয়া হোক এবং ভালো কাজের পুরস্কার দেয়া হোক, তখন আল্লাহ্ সম্বন্ধে মানুষ কি ধারণা রাখে?

মানুষ কি মনে করে, সব বিচারকের বড় বিচারক ইনসাফ করবেন না? ভালো ও মন্দ সবাইকে কি তিনি একভাবে দেখবেন? সবচাইতে ভালো ও নিকৃষ্ট খারাপ মানুষকে মৃত্যুর পর সমানভাবে মাটিতে পরিণত করবেন? কারো পাপ-পুণ্যের প্রতিদান দিবেন না? আল্লাহ্ সম্পর্কে এ কেমন বাজে ধারণা তোমরা পোষণ কর?

আল্লাহ এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলছেন, - أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ. "অনুগত মুসলমান বান্দাদের কি আমরা পাপিষ্ঠ বান্দাদের একই কাতারে শামিল করে দেব? তোমরা কেমন করে এরূপ ফয়সালা করতে পার?" (আল-কালাম : ৩৫-৩৬)

শিক্ষা : ১। মানুষকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত উপাধি দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ মানবকুলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২। মানুষকে যে শারীরিক উত্তম গঠন ও মানসিক বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চিন্তাশক্তি ও বিবেচনাশক্তি দান করা হয়েছে, অন্য কোন প্রাণীকে তদ্রূপ দেয়া হয়নি।

৩। সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুষ্কৃতির পথে পরিচালিত করে নিচের দিকে গড়িয়ে যেতে যেতে এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌছে যায় যে, অন্য কোন সৃষ্টি এমন পর্যায়ে পৌছতে পারে না।

৪। আমরা যেন ঈমান ও আমলের দ্বারা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ করে অফুরন্ত পুরস্কারের অংশীদার হতে পারি, যার ধারাবাহিকতা কোন দিন শেষ হবে না।

বাস্তবায়ন : এ সূরায় আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে দুষ্কৃতির অশুভ পরিণাম ও সুকৃতির পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে যে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা যেন সেই শিক্ষা গ্রহণ করে ঈমান ও আমলের দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার রেজামন্দী হাসিল করে অফুরন্ত ও অনন্ত পুরস্কার লাভ করে ধন্য হতে পারি, এ তাওফীক কামনা করে আজকের মত এখানেই আমার দারস শেষ করছি। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ১৬

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মুসলমানদের বিজয়

৪৮. সূরা আল-ফাতহ্

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২৯, রুকূ-৪

আলোচ্য আয়াত : ২৮, ২৯।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٢٨) هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ (٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا،سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ-ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ-كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ-وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (২৮) "তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (২৯) মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং যেসব লোক তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে, সিজদায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখাবয়বে সিজদার চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত হয়। তাদের এ গুণ পরিচিতি তাওরাতে

উল্লিখিত রয়েছে। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপই তাদের দৃষ্টান্ত একটা চারা গাছ যা থেকে অংকুর বের হয়, তারপর শক্ত ও পুষ্ট হয়ে উঠে। এরপর তা স্বীয় কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়। তা চাষীদের জন্য আনন্দ দায়ক যে কাফিররা এ সবের ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়ার দরুন হিংসায় জ্বলতে থাকে। যারা ঈমান এনেছে ও নেক আলম করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।"

শব্দার্থ : هُوَ - তিনি, اَلَّذِىْ - যিনি, اَرْسَلَ - পাঠিয়েছেন, بِالْهُدٰى - হেদায়াত সহকারে, دِيْنِ الْحَقِّ - সত্য জীবন ব্যবস্থা, لِيُظْهِرَهٗ - তা বিজয়ী করার জন্য, اَلدِّيْنِ كُلِّهٖ - অন্যান্য সব দ্বীন, كَفٰى - যথেষ্ট, بِاللّٰهِ - আল্লাহর এ বিষয়ে, شَهِيْدًا - সাক্ষ্যদাতা, اَشِدَّاءُ - তারা কঠোর, اَلْكُفَّارُ - কাফেরদের, رُحَمَاءُ - তারা দয়াশীল, تَرٰهُمْ - তুমি তাদেরকে দেখবে, رُكَّعًا - রুকুকারী, سُجَّدًا - সিজদাকারী, يَبْتَغُوْنَ - তারা সন্ধান করে, فَضْلاً - অনুগ্রহ, رِضْوَانًا - সন্তুষ্টি, سِيْمَاهُمْ - তাদের চিহ্ন, وُجُوْهِهِمْ - তাদের মুখমণ্ডলে, اَثَرِ - প্রভাবে, اَلسُّجُوْدِ - সিজদাসমূহের, كَزَرْعٍ - দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছের, اَخْرَجَ - বের করে, شَطْئَهٗ - তার অঙ্কুর, فَاٰزَرَهٗ - এরপর তাকে শক্তিশালী করে, فَاسْتَغْلَظَ - শক্ত হয়, فَاسْتَوٰى - দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, سُوْقِهٖ - তার কাণ্ডের, يُعْجِبُ - আনন্দ দেয়, اَلزُّرَّاعَ - চাষীদেরকে, لِيَغِيْظَ - গাত্রদাহ করে, وَعَدَ - অঙ্গীকার, مَغْفِرَةً - ক্ষমা, اَجْرًا - পুরস্কার, عَظِيْمًا - বিরাট।

নামকরণ : সূরার প্রথম আয়াত اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا۔ থেকে এর নাম গৃহীত। এতে যে ফাত্হ শব্দটি রয়েছে তাকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে এ সূরার বিষয়বস্তু এ সূরার নামের মধ্যে নিহিত। কেননা এ সূরায় সেই ফাত্হ বা বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যা আল্লাহ তায়ালা হুদাইবিয়ার সন্ধিরূপে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও মুসলিম জাতিকে দান করেছেন।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : হাদীসের সকল বর্ণনার ঐক্যমতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ষষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসে যখন নবী করীম (সা) মক্কার কাফেরদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করার পর মদীনা শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন ঠিক সেই সময়ে সূরাটি নাযিল হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি : একদা নবী করীম (সা) ওমরা করার স্বপ্ন দেখলেন। তাই তিনি চৌদ্দ শত সাহাবীর এক বিরাট কাফেলা নিয়ে মক্কার দিকে সফরে বের হলেন। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকের সাথে একটি করে তরবারি নিলেন। কুরবানীর চিহ্নসহকারে ৭০টি উট সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। যুলহুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বেঁধে লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ধ্বনি করতে করতে বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে অগ্রসর হলেন। ৬টি বৎসর যাবৎ মুসলমানদের জন্য কা'বা ঘরে যাওয়া বন্ধ ছিল। ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে আরবের সমস্ত শক্তি নিয়ে কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আহযাব যুদ্ধ সংগঠিত করলো। এ বিপুল কাফেলা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁরই রক্তপিপাসু দুশমনদের নিজস্ব অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হলেন, এর পরিণতি দেখার জন্য সমগ্র আরবের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ।

নবী করীম (সা)-এর এ অগ্রযাত্রায় কুরাইশরা কঠিনভাগে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। যিলকাদ মাস হারাম মাসগুলোর মধ্যে একটি। হারাম মাসগুলো হজ্জ ও ওমরা করার জন্য সংরক্ষিত ও সম্মানার্হ মাস। এ মাসে চরম শত্রুকেও বাধা দেয়ার নিয়ম নেই। মহানবী (সা)-কে যদি বাধা না দেয়া হয় তাহলে কুরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আঘাত পড়ে। তাই উভয় সংকটে পড়ে তারা দিশেহারা। শেষ পর্যন্ত জাহিলী আত্মসম্মানবোধ ও অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা তাঁকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

খালিদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে দুই শত উষ্ট্রারোহী সৈন্য মুসলমানদের যাত্রাপথে বাধা দিয়ে যুদ্ধ সংঘটিত করার জন্য পাঠানো হলো। নবী করীম (সা) এ খবর পেয়ে পথ পরিবর্তন করে দুর্গম পথে অতি কষ্টে হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন। কুরাইশগণ বারবার বিভিন্ন কৌশলে বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু কোন কৌশলেই কাজ হলো না। নবী করীম (সা) হযরত

উছমান (রা)-কে দূত নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠালেন। তিনি মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে জানালেন, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসি নাই। যিয়ারত ও তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কুরবানীর জন্তুসহ এসেছি। আমরা তাওয়াফ ও কুরবানী করে ফিরে যাবো। কিন্তু তারা এ কথা মেনে নিল না। তারা হযরত উছমান (রা)-কে আটক করে রাখলো। এ সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত উছমান (রা)-কে শহীদ করা হয়েছে। তিনি ফিরে না আসায় মুসলমানগণ এ কথা বিশ্বাস করলেন। ব্যাপার যখন দূত হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে, এরপর ধৈর্য ধারণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার অবকাশ ছিল না। তাই নবী করীম (সা) সকলকে একত্র করে তাদের নিকট থেকে এ কথার উপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, "অতঃপর আমরা এখান থেকে মৃত্যু পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করবো না। দূত হত্যার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বো। এটাই বাইয়াতে রিদওয়ান নামে ইসলামের ইতিহাসে খ্যাত।

পরবর্তী সময়ে জানা গেল যে, হযরত উছমান (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদটি ছিল ভুল। তিনি নিজেও যথাস্থানে ফিরে আসলেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সন্ধির কথাবার্তা বলার জন্য রাসূলে করীম (সা)-এর ক্যাম্পে উপস্থিত হলো। উভয় পক্ষের দীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তসমূহের ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি লিপিবদ্ধ হলো।

এক. দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

দুই. এ সময়-কালের মধ্যে কুরাইশদের কোন লোক তাদের নেতার অনুমতি ব্যতীত মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে। আর মদীনার কোন লোক মক্কায় গেলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

তিন. আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে যে কোন গোত্র যে কোন পক্ষের মিত্র হয়ে এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

চার. মুহাম্মদ (সা) এ বছর ফিরে যাবেন। আগামী বছর উমরা করার জন্য এসে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। একখানা করে তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে আনা যাবে না।

সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে হয়েছে বলে সাহাবাগণ

সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বিশেষ করে হযরত ওমর (রা) ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে একবার হযরত আবু বকর (রা) নিকট গিয়ে বলেন, নবীজী কি আসলে নবী নন? আমরা কি মুসলিম নই? ওরা কি মুশরিক নয়? তাহলে আমরা এমন অপমান ও লাঞ্ছনা কেন মাথা পেতে মেনে নেব। হযরত আবু বকর জবাবে বললেন, তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখনও তাঁকে ধ্বংস করবেন না। পরবর্তী কালে হযরত উমর (রা) এ ঘটনার জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত নফল নামায ও দান-সদকা করেছেন যেন আল্লাহ নবী করীম (সা)-এর সাথে কৃত বেয়াদবির অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

সন্ধির চুক্তিপত্র লিখিত হচ্ছিল ঠিক সে সময় সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জান্দাল কাফেরদের বন্দীখানা থেকে পায়ে বেড়ি লাগানো অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর ক্যাম্পে উপস্থিত হলেন। তাঁর সমগ্র শরীরে অত্যাচার ও নিপীড়নের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট ফরিয়াদ করলেন, 'আমাকে এ অন্যায় ও অকারণ বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিন। সাহাবীগণের পক্ষে এ মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করে নেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সুহাইল ইবনে আমর বলল, সন্ধির শর্তানুযায়ী আমার পুত্রকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিতে আপনি বাধ্য। নবী করীম (সা) আবু জান্দালকে আল্লাহর যিম্মায় সোপর্দ করে জালিমদের হাতে দিয়ে দিলেন।

সন্ধিপত্র লেখার পর পড়ে শুনানো হলো। এতে "আল্লাহর রাসূল" কথাটির উপর কুরাইশগণ আপত্তি তুললো। নবী করীম (সা) যে আল্লাহর রাসূল এ কথা তারা মানে না। এ কথাটি সন্ধিপত্র থেকে বাদ দিতে হবে। সন্ধি লেখক হযরত আলী (রা)-কে ঐ শব্দ দু'টি কেটে দিতে বললেন। হযরত আলী বললেন, 'আমার জীবন গেলেও আমি এ কাজ করব না। নবী করীম (সা) বললেন, আমার হাতে কলম দাও, আর ঐ দু'টি শব্দ দেখিয়ে দাও। তখন তিনি নিজ হাতে "আল্লাহর রাসূল" শব্দ দু'টি কেটে দিলেন।

সন্ধি চুক্তির কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম (সা) সমবেত সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা এখানেই কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম খুলে ফেল। কেউ কান দিল না। নবীজী কথাটা তিনবার বললেন, তারপরও কেউ পালন করল না। নবী করীম (সা) মর্মাহত হয়ে নিজ

ক্যাম্পে গিয়ে উম্মুল মুমেনিন হযরত উম্মে সালামা (রা)-র নিকট তাঁর এ দুঃখ ও ক্ষোভের কথা জানালেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নিজে আগে কুরবানী করুন, মস্তক মুণ্ডন করুন ও ইহরাম খুলুন। এরপর সাহাবাগণ অবশ্যই আপনার অনুসরণ করবে। বাস্তবে তাই হলো। কিন্তু তাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হলো না।

এ কাফেলা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে নিজেদের চরম ব্যর্থতা, অপমান ও লাঞ্ছনা, গ্লানি মনে করে মদীনার দিকে ফিরে যেতে লাগলো। মক্কা থেকে ২৫ মাইল দূরে "দাজনান" নামক স্থানে পৌঁছামাত্র সূরা ফাত্‌হ নাযিল হয়। এ সূরায় কাফেলার লোকদেরকে বলা হলো, তোমরা এ সন্ধিকে অপমান, লাঞ্ছনা, ব্যর্থতা ও পরাজয় মনে করলেও আসলে এটাই তোমাদের মহাবিজয় বয়ে আনবে। নবী করীম (সা) সমস্ত মুসলিম জনতাকে একত্রিত করে বললেন, আজ আমার উপর এমন একটি জিনিস নাযিল হয়েছে যা দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক মূল্যবান। তারপর তিনি সকলকে এ সূরা পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই এ সন্ধির কল্যাণ এক একটি করে প্রকাশ পেতে শুরু করলো। তখন এ সন্ধি যে ইসলামের জন্য এক মহাবিজয়ের সূচনা হয়ে দেখা দিল তাতে কারও বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ থাকলো না। (বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনে উক্ত সূরার "ঐতিহাসিক পটভূমি" দেখুন)।

ব্যাখ্যা : (ক) هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

"তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন একে আর সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

এখানে একথা বলার কারণ হচ্ছে– হুদাইবিয়াতে যখন সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কাফেররা নবীজীর সম্মানিত নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ লেখায় আপত্তি করেছিল। তাদের বারবার দাবীর চাপে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই চুক্তিনামা থেকে শব্দটি মুছে ফেলেছিলেন। রাসূলের রাসূল হওয়া এমন এক মহাসত্য ব্যাপার, তা কেউ মানুক আর না মানুক তাতে কিছু যায় আসে না। এ বিষয়ের সত্য হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

(খ) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর ও পরস্পর পূর্ণ দয়াশীল।"

আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে فَلَانٌ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ - "অমুক ব্যক্তি তার প্রতি কঠোর।" অর্থাৎ তাকে চাপ দিয়ে নত করা, বশে আনা ও নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূল বানানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরাম এমন মোমের পুতুল নন যে কাফেররা যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে তাঁদের ফিরাবেন। তাঁরা এমন কোমল তৃণ ছিলেন না যে, কাফেররা অনায়াসে তাঁদের চিবিয়ে খাবে। কোন ভয় দ্বারা তাঁদের দাবানো যাবে না, কোন প্রলোভন ও প্ররোচনা দ্বারা তাঁদের খরিদ করা যাবে না। যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা জীবন-মরণ পণ করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন তা থেকে তাদেরকে বিরত করার সাধ্য কারও নেই।

ঈমানদারদের যত কঠোরতা, অনমনীয়তা ও দুশমনি সব ইসলামের শত্রুদের জন্য। আর ইসলামী জীবনের আদর্শ-উদ্দেশ্য যাদের একই সূত্রে গাঁথা তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালোবাসা, সহৃদয়তা, সহায়তা, সহযোগিতা, মায়া-মমতা, নমনীয়তা, সহানুভূতিশীলতা, দানশীলতা, ঐক্য ও আনুকূল্য সৃষ্টি করে দেয়।

(গ) تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ -

"তোমরা তাদের রুকূতে, সিজদায় ও আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষের সন্ধানে

আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। সিজদাসমূহের চিহ্ন তাদের মুখাবয়বে ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র সহকারে পরিচিত।"

আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহভীতি, সম্ভ্রমশীলতা, সচ্চরিত্রতা, আল্লাহপরস্তির নূর ও আল্লাহর আনুগত্যের জ্যোতি এদের চেহারাতে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। চেহারাই মনের প্রতিচ্ছবি। আবার বলা হয়েছে, মানুষের মুখমণ্ডল একখানি উন্মুক্ত কিতাব; এর পৃষ্ঠাগুলোতে ব্যক্তির মনমানসিকতার প্রকৃত অবস্থা অতি সহজেই ধরা পড়ে যায়। একজন অহংকারী ও চরিত্রহীন ব্যক্তির আকৃতি-প্রকৃতি ও একজন বিনয়ী চরিত্রবান, নির্মল, ভদ্র ও আল্লাহভীরু ব্যক্তির আকৃতি ও প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত কথাটির তাৎপর্য এই যে, মুহাম্মদ (সা)-এর এসব সঙ্গী-সাথী এমন যে, তাঁদেরকে দেখামাত্রই যে কোন লোক বুঝতে পারে, এরাই হলেন সর্বোত্তম মানুষ। তাঁদের চেহারায় আল্লাহর নূর জ্বলজ্বল করছে।

(ঘ) ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَاٰزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ -

তাদের এ গুণ পরিচিতি তাওরাতে উল্লিখিত রয়েছে। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, যেন একটা শষ্য ক্ষেত; প্রথমে এর অংকুর বের হয়, তারপর তাকে শক্তি যোগান হয়। অতপর তা মোটা ও শক্ত হয়ে উঠে। এরপর তা স্বীয় কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়। তা চাষীদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয় যে কাফিররা এ সবের ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়ার দরুন হিংসায় জ্বলতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিত্রায়িত দৃশ্যটিতে চাষী শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ ইসলাম নামক বাগানে তিনি যে চারা রোপন করেছেন, সেই চারা বড়, শক্তিশালী ও পুষ্ট হয়ে বাগানের শোভা বর্ধন করছিল। এই শক্তিশালী সুন্দর বৃক্ষরাজি হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা)।

এই সুন্দর বাগান দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হন আর কাফেরদের মনে হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়।

সম্ভবত এখানে "দ্বিতীয় বিবরণ" ৩৩ অধ্যায় ২-৩ শ্লোকের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে রাসূলে করীম (সা)-এর মহান আগমনের উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (সা)-এর কোন গুণ পরিচয়ের কথা পূর্বের তাওরাতে উল্লেখ থাকলেও বর্তমান পরিবর্তনশীল তাওরাতে তা পাওয়া যায় না।

হযরত ঈসা (আ)-এর একটি ওয়ায বাইবেলের নূতন নিয়ম-এর ধর্ম পুস্তকে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে :

'তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অংকুরিত হয়ে বেড়ে উঠে কিরূপে তা সে জানে না। ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অংকুর পরে শীষ, তারপর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পেকে গেলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটার সময় উপস্থিত। তা একটি সরিষার দানার তুল্য; সে বীজ ভূমিতে বুনিবার সময় ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু বুনা হলে তা অংকুরিত হয়ে সকল শাক হতে উঠে এবং বড় বড় ডাল ফেলে; তাতে আকাশের পক্ষিগণ তার ছায়ার নীচে বাস করতে পারে। (মার্ক লিখিত সুসমাচার, ৪ শ্লোক ২৬-৩২)

(৬) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।"

এখানে আল্লাহ ঈমানদার সালেহীনদের জন্য এক মহা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করছেন। সেটি হচ্ছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। যদিও এই ক্ষমা ও প্রতিদানের ওয়াদা ঈমান ও সৎ কাজের গুণে গুণান্বিত সকলের জন্যই করা হয়েছে, তারপরও সাহাবায়ে কেরামই সর্বপ্রথম এ ওয়াদার ফল ভোগ করবেন। কারণ ঈমান ও সৎ কাজের গুণ তাদের মাঝে ছিল পূর্ণাঙ্গরূপে।

শিক্ষা : ১. মুমিনগণ হবেন কাফেরদের প্রতি (তাদের বিশ্বাসের প্রতি) কঠোর এবং নিজেরা পরস্পর দয়াশীল।

২. ঈমানদারদের উচিৎ রুকূ, সিজদা, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে আত্মনিয়োগ করা।

৩. সিজদার দ্বারা সৃষ্ট কপালের সেই কালো দাগ নয়; বরং খোদাভীতি, খোদা পরস্তির নূর ও আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের জ্যোতি এদের চেহারায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, যার দ্বারা তাঁরা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত হয়।

৪. আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও নেক আমলকারীদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ প্রতিফলের ওয়াদা করেছেন।

বাস্তবায়ন : এ দারসে ঈমান ও আমলের দ্বারা চেহারায় যে নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা ঈমানদারগণ স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিতি লাভ করেন। আমরাও যেন সেই জ্যোতির্ময় চেহারাবিশিষ্ট হয়ে আল্লাহর ক্ষমা ও শুভ প্রতিফলের প্রত্যাশা করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে এখানেই আমার দারস শেষ করছি। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।